আকাশলীনা

– হাফিজ রশীদ

টানা দুই দিন দুই রাত ট্রেন জার্নি করে আমরা যখন আগ্রা পৌছালাম তখন সবাই ক্লান্ত এবং বিধ্বস্ত। আমরা আগ্রা গিয়েছিলাম তাজমহলের লোভে। তাজমহল ভালো লাগলো না। তারপরও আগ্রার স্মৃতি বেশ জ্বলজ্বলে। কারণ এক এলিয়েন বা বিদেশিনী এবং তার সানগ্লাস।

এলিয়েন–এর সঙ্গে পরিচয় তাজমহলের পেছনে যমুনা নদীর পাশে। ইনডিয়ানরা যমুনাকে বলে *ইয়ামুনা*। স্পষ্ট মনে আছে, সেদিন ছিল সোমবার। কারণ সোমবারে টুরিস্টদের ফৃ ঢুকতে দেয়। আমাদের ত্রিশ রুপি বেচে গেল।

যমুনায় সেদিন ছিল ভরপুর জোয়ার। দূরে কাশবন। আমি একটার পর একটা স্ন্যাপ নিচ্ছি। এক সময় দেখলাম আমার পেছনে এক ধবধবে সুন্দরী, ততোধিক শাদা ধবধবে একটা স্কার্ট পরা।

এক সময় বললাম, তুমি কি আমার সঙ্গে একটা ছবি তুলবে?

সে রাজি হলো।

ঝামেলাটা হলো ছবি তোলার পর। আমি এলিয়েনের কাধে হাত দিয়ে ছবি তুলছি। ছবি তোলার পর কেমন করে যেন তার চোখে হাত লেগে সানগ্লাস পড়ে গেল। পড়ে গেল তো পড়ে গেল, একেবারে যুমনা নদীতে।

হতবাক হয়ে গেলাম। এলিয়েন, (ছোট করে এলি) কিছুই বললো না। নো প্রবলেম, নো প্রবলেম। থ্যাংকস, বলে গট গট করে চলে গেল।

এলি এতোই রেগে গিয়েছিল, একবারও পেছন ফিরে তাকালো না। আমি তাকে ফলো করতে গিয়ে দেখি সে ট্যাকসি নিয়ে চলে গিয়েছে।

পরের দিন মঙ্গলবার আবারও তাজমহলে গেলাম। একা, সঙ্গে শুধু একটা ইয়াশিকা ক্যামেরা। তাজমহলের পেছন দিকে পিলারের কোণায় বসে একা একা সিগারেট খাচ্ছিলাম। তাজমহেলের বাউন্ডারির মধ্যে ধূমপান নিষিদ্ধ।

তারপরও সন্ধ্যা হবার আগে আগে কবি, সাহিত্যিকরা যাকে গোধূলি বলে সেই সময় এলি এলো।

আমার মতো সামান্য একজন বাংলাদেশির কথা মনে করে সে আমার কাছে আসবে তা ছিল আমার কাছে কল্পনাতীত।

এলি এসে বললো, আমি কি তোমার পাশে বসতে পারি?

বিস্ময় প্রকাশ করতে পারলাম না। শুধু বললাম, অবশ্যই।

এলি বৃটিশ নাগরিক, বয়স তেইশ প্লাস। সে লন্ডনের পড়াশোনা করে। বিষয় এনথ্রপলজি। এলিরা পাচ বন্ধু আগ্রা হয়ে কাশ্মির যাবে।

এলিরা থাকতো আমার পাশের হোটেল *আকবর*–এ। আমি তার রুমে গেলাম।

সে আমাকে আঙ্গুর খেতে দিল।

আমি তাকে নিয়ে আরো কয়েকটা ছবি তুললাম।

পরবর্তী দুই দিন আমার ঝড়ের মতো কেটে গেল। এলিকে নিয়ে মার্কেটে গেলাম, তাকে একটা পার্স কিনে দিলাম। ইচ্ছে ছিল একটা শাড়ি কিনে দিই। নীল রঙের একটা শাড়ি। কারণ এলিরা নীল আকাশের মতো দূরে থাকে। এদের কাছে যাবার অধিকার আমাদের নেই। এলিকে নিয়ে আমার কোনো রোমান্টিক স্মৃতি নেই। একবারও মনে হয়নি এলিকে নিয়ে এক খাটে ঘুমাবো কিংবা একটা কিস দেবো।

এলির স্মৃতি বলতে কয়েকটা ছবি। বিশেষ করে তাজমহলের পেছনে কাধে হাত দেয়া সানগ্লাস পরা ছবিটা। এই ছবিটা দেখলে আমার আম্মা বলেন, মেয়েটা কি মুসলমান?

গোপালপুর, কাশিগঞ্জ, ত্রিশাল থেকে

রক্তিম চোখ

– নূরে আলম মুকতা

হারাম রোজগারের রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত হলেন বাবা। বড় ভাইয়ের আদেশ মান্য করলেন। সরকারি চাকরি ছেড়ে দিলেন। দারুণ কুসংস্কারমুক্ত আমাদের মা অনেক কাদলেন। বাড়ি ফিরে এলেন বাবা। পৈতৃক সম্পত্তিতে হাত দিলেন। ধীরে ধীরে এক সময় তা তলায় এসে ঠেকলো। সাত সাতজন মানুষের হাবিয়া দোযখ পেট। এ আগুন নেভায় কে! তখন বাবার বড় ভাই আদেশ নির্দেশ কিছুই দেন না।

মেধাবী বাবা আমাদের ক্ষুণ্নিবৃত্তির জন্য শুধুই কাজ খোজেন। হালাল কাজ। অবশেষে আম্মার পরামর্শে মেধা বিক্রির সিদ্ধান্ত নিলেন। বাড়িতে বসালেন টিউশনির হাট। বাড়ির প্রাইভেসি বলতে আর কিছুই রইলো না। সকাল-বিকাল, দুপুর-সন্ধ্যায় বাবা ছাত্রছাত্রী পড়ান। ঘরে-বাইরে, অন্দর মহল সব জায়গায় বাবার ছাত্র কিলবিল করে। আমরা সাত ভাইবোনও তাদের মধ্যে কিলবিল করি। বাবার প্রসার দিন দিন বেড়েই চলছে। সুনাম তো আগেও ছিল, আরো বাড়লো।

জোড়াতালি আর আম্মার বুদ্ধিতে সংসারের চাকা গড়িয়ে যায় কোনোমতে। বাবার সঙ্গে বাজারে যাচ্ছি। এক ছাত্র পথ আগলে দাড়ালেন। এক টুকরো কাগজ আর কলম এগিয়ে দিয়ে স্যার এই অংকটা। অমনি বাবা পাশের চায়ের দোকানে বসে পড়লেন।

আম্মা এদিকে বাড়িতে রসুনের অভাবে ডাল ফোড়ন দিতে পারছেন না। বাজারে যখন গেলেন বাবা তখন দরকারি অনেক জিনিসই ফুরিয়ে গেছে।

বাড়ি ফিরে দেখি আম্মা দরজায় দাড়িয়ে।

গণিত, ঐচ্ছিক গণিত, ত্রিকোণমিতি, গ্রামার আর ব্যাকরণের সমস্যা সমাধান করেন বাবা নিমেষেই। বাবার সব মুখস্থ। কিন্তু শরীর আর চলে না। বড় ভাইয়ের সামান্য রোজগার যদিও সংসারে যুক্ত হলো তবুও বাবার কষ্ট বেড়ে গেল। বাবার শরীরের মূল অঙ্গ বিদ্রোহ করে বসলো। চোখ লাল হয়ে যায় বাবার। পানি পড়ে। মাঝে মধ্যেই দুনিয়া আধার দেখেন।

আমাদের যে বাবা বন্ধুকে সুট-কোট বিলিয়ে দিয়েছিলেন সে বাবা চশমা কিনতে পারেন না। এখানে বলে রাখা ভালো, অসংখ্য ছাত্রছাত্রী বাবার টিউশনির টাকা না দিয়ে পালিয়েছে। এমনও শুনেছি, ছাত্রছাত্রীর গার্ডিয়ান দিয়েছেন বেশি টাকা। কিন্তু বাবা পেয়েছেন কম। তবু বাবা কাউকে কিছু বলতেন না।

এক প্রতিষ্ঠিত ছাত্রের কল্যাণে বাবার এক জোড়া লেন্স যদিও জুটলো তাও আবার দোকান থেকে কেনা, কোনো ডাক্তার দেখিয়ে নয়। তা দিয়েই বাবা সংগ্রাম চালিয়ে যেতে লাগলেন।

একদিন অসতর্ক মুহূর্তে বাবার চশমার ফ্রেম ভেঙে গেল। গ্রামে তো চশমার দোকান নেই। বিভাগীয় শহর রাজশাহী যেতে হবে। আজ এই অবকাশে আমার জীবনের একটি অসহ্য যন্ত্রণার কথা জানিয়ে দিতে চাই। বহুদিনের বয়ে নিয়ে বেড়ানো যন্ত্রণা কমানোর চেষ্টা করছি।

আমি তখন ক্লাস এইটের ছাত্র। বাবা গ্রামের এক স্বর্ণকারের সঙ্গে বাজারে আমার সামনে চশমার সমস্যার কথা বললেন।

স্বর্ণকার বললেন, ছেলেকে দিয়ে আমার বাড়ি পাঠাবেন, মেরামত করে দেবো।

বাবার ছোট সন্তান বলে আমাকেই বাড়িতে টুকিটাকি কাজগুলো আজও দেখতে হয়। তখনো করতে হতো। কিন্তু এবার মহা বিপত্তি ঘটলো। কষ্টটুকু তো আমার একার হয়ে গেল চিরদিনের জন্য। বাবার চশমা হাফ প্যান্টের সাইড পকেটে ঢুকিয়ে বড় ভাইয়ের সাইকেল নিয়ে ছুটছি প্রাণপণে স্বর্ণকারের বাড়ির দিকে, হুশ নেই। আমার নেশা হলো যতো দ্রুত সম্ভব চশমা ঠিক করে এনে দিতে হবে।

বিধি বাম। স্বর্ণকারের বাড়ি গিয়ে দেখি চশমা পকেটে নেই। এক মাইল রাস্তা ছল ছল চোখে খুজে বাড়ি ফিরলাম। বাবার চশমা হারিয়ে গেল।

সিংহ রাশির জাতক বাবা আমাকে কিছুই বললেন না। এমনকি আম্মাকেও জানালেন না। জানলেন বাবা আর অভাগা আমি। বাবার খুব কষ্ট হয়েছিল কয়দিন। ভীষণ কষ্ট।

বাবার বন্ধুর তার জোড়া দেয়া ফ্রেমের একটি চশমা দিয়ে চালিয়েছিলেন বহুদিন। নতুন চশমা একটি কিনেছিলেন অনেক পরে। কিন্তু ততোদিনে বাবার আয়ু ফুরিয়েছে। বাবাও তার সমস্ত মেধা বিক্রি করে দিয়েছিলেন। ব্রেইন হেমরেজ হলো। বাবা মারা গেলেন।

আমার কষ্ট কমানোর জন্যে বাবার মৃত্যুর পরে আম্মার চোখের সামান্য সমস্যা হতেই ডাক্তার দেখিয়ে চশমা কিনে দিয়েছিলাম। *দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর* চেষ্টা আর কি! কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস! মাকেও চশমা চোখে বেশি দিন দেখতে পেলাম না। প্রিয়তমা স্ত্রীকে কথা দিয়েও তার কৃতিত্বের নিদর্শন স্বরূপ আজও চশমা কিনে দিতে পারিনি।

চশমা আমার জীবনের একটি কষ্টকর বস্তুর নাম। চশমাতে হাত দিলেই মানসপটে ভেসে আসে এই গ্রহের ভীষণ কষ্ট সহিষ্ণু আমার বাবার কষ্টে জর্জরিত এক জোড়া রক্তিম চোখ।

ভোলারহাট, চাপাইনবাবগঞ্জ থেকে

হারিকেন

– মোহাম্মদ বশির উদ্দীন

তখন ক্লাস নাইন–এ পড়ি। গ্রামের স্কুল। হস্টেল ছিল না কোনো। তবে আমরা প্রায় পঞ্চাশজন স্কুলে থেকে পড়াশোনা করতাম। বিদ্যুৎ তখনো আমাদের গ্রামে পৌছেনি। হারিকেনের আলোতেই পড়তে হতো।

একদিন সন্ধ্যায় জ্বালাতে গিয়ে দেখি আমার হারিকেনটি যথাস্থানে নেই। বুঝতে আর বাকি রইলো না যে, আমার হারিকেনটি চুরি হয়ে গিয়েছে। আমাদের জন্য এটা ছিল একটা নিত্যদিনের অভিজ্ঞতা। কারণ শুধু হারিকেনই নয় – বই, কলম, খাতা, শার্টসহ ব্যবহার্য অনেক জিনিসই মাঝে মধ্যে উধাও হয়ে যেতো।

রাতে আমাদের স্কুল লাইব্রেরিতে থাকতেন রহিমস্যার। খুব রাগী। তার কাছে আমরা নালিশ করতাম।

তিনি চুরির অভিযোগ শুনতে শুনতে তো একদিন মন্তব্যই করে বসলেন, যতোসব চোর পড়াচ্ছি।

তাছাড়া একবার স্কুলে থাকা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করেও দিলেন। ইউনিভার্সিটিতে গোলাগুলি হলে যেমন ছাত্রাবাস বন্ধ থাকে তেমনটি হয়েছিল চুরির কারণে।

যাই হোক। আমার হারিকেনটা আর নেই। মহা বিপদ! হারিকেন ছাড়া পড়বো কি করে! স্যারকে জানালাম। অনেক খোজাখুজি, জিজ্ঞাসাবাদ করা সত্ত্বেও হারিকেন আর উদ্ধার হলো না।

তার প্রায় পাচ সাত মাস পরের কথা। আমার সহপাঠী দুই আপন ভাই বাজারের ভেতরে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতো। একদিন সন্ধ্যায় একটা বই ধার আনার জন্য তাদের বাসায় গেলাম। তারা তখন পড়ছিল। বাসার ভেতরে ঢুকেই দেখি আমার সহপাঠী একটা চশমা পরে পড়ছে।

বললাম, আরে দোস্ত, তুই চশমা কিনলি কবে? দে তো দেখি আমাকে কেমন মানায়?

সে দিল। চশমাটা চোখে দিয়ে চশমার কাচের ভেতর দিয়ে প্রথম যে জিনিসটি দেখতে পেলাম সেটি আমার চুরি হয়ে যাওয়া সেই হারিকেনটি। অবাক হয়ে গেলাম। তারা ছিল আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু। আর ওরাই কি না! আমি আর ভাবতে পারলাম না। বললাম, দোস্ত, তোর চশমায় তো দেখছি বেশি পাওয়ার। আমি কেমন যেন একটু বেশি বেশি দেখছি। চশমাটা আমাকে দিবি? সঙ্গে সঙ্গেই বললাম, চশমা না দিলেও আরেকটি জিনিস অবশ্যই আমাকে দিতে হবে।

ওই দিন হারিকেনটার কথা আর বললাম না। পরের দিন বলার পরে তারা আমার হারিকেনটা ফেরত দিয়েছিল। ঘটনাটা অন্য কাউকে বলিনি। তার চশমা দিয়ে হারিকেনটা পেয়েছি বলে রহিমস্যারকে দিয়ে উত্তম মধ্যমটা আর খাওয়ালাম না।

কুষ্টিয়া থেকে

বরষা

– মোহাম্মদ আনছার আলী

অসম্ভব শান্ত, অথচ ততোটাই দুরন্ত মনের কিশোর ছিলাম এই আমি। বংশ পরম্পরায় দুটো জিনিস পেয়েছি। জলপাই রঙের নিষ্পাপ একটা মুখে উন্নত একটা নাক, তার পাশে ভাসাভাসা দুটো চোখ। তার ওপরে ঝাকড়া ঘন–কালো চুলগুলো যেন প্রকৃতির অকৃপণ হাতের দান। হলে কি হবে? মায়াবী চোখ দুটো আমার সারাক্ষণ ঢাকা পড়ে থাকতো চশমার পুরু দুটো লেন্সে। অবশ্য এতে আমার কোনো আক্ষেপ বা অনুশোচনা আগেও ছিল না, আজও নেই। আর থাকবেই বা কেন? এই পুরু লেন্সের চশমাই না আমাকে খুজে দিয়েছে আমার মনমানসী বরষাকে।

এসএসসি পরীক্ষায় স্টার মার্কস পেয়ে পাস করলাম। দুরু দুরু হৃদয়ে একরাশ স্বপ্ন নিয়ে হাজির হলাম রাজশাহী শহরে। একে–বেকে শুয়ে থাকা নদী পদ্মা। তারই তীর ঘেষে এ শহর। আজও আমাকে প্রতিনিয়ত আকর্ষণ করে। এর অলিতে–গলিতে, দোকান অথবা রেস্তোরায়, পার্কে কিংবা নদী রক্ষাবাধকে ঘিরে ছড়িয়ে–ছিটিয়ে আছে আমার শত সহস্র স্মৃতি। আমাকে আর বরষাকে নিয়ে। অন্য দশটা শহর থেকে এ শহরটার আলাদা একটা চরিত্র আছে। আরো অন্য দশটা প্রাচীন শহরের মতো নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও শুধু বাণিজ্য কেন্দ্রিক নয় এ শহর। এখানেই এ শহরের সঙ্গে অন্য দশটা শহরের তফাত।

তৎকালীন নাটোরের রাজা বা জমিদাররা তাদের সন্তানাদির শিক্ষার কথা ভাবতে গিয়ে রাজশাহী শহরে প্রতিষ্ঠা করেন কলেজিয়েট স্কুল, রাজশাহী কলেজসহ আরো কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। উদ্দেশ্য, জমিদারির উদ্দাম ও বেপরোয়া জীবন যাপনের ঘটনাগুলোকে ভবিষ্যৎ বংশধরদের দৃষ্টির অন্তরালে রাখা। সঙ্গে সঙ্গে তাদের সুশিক্ষা নিশ্চিত করা। পরবর্তীকালে তদানীন্তন সামরিক শাসক আইয়ুব খানের আমলে রাজশাহী ইউনিভার্সিটি, মেডিকাল কলেজ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজসহ আরো কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। ফলে শহরটির শিক্ষা কেন্দ্রিক চরিত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আজও শহরটি মূলত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শহর হয়ে তার অতীত গৌরবকে ধারণ করছে।

আমার বড় ভাই ছিলেন রাজশাহী ইউনিভার্সিটির রাজনীতি বিজ্ঞানের ছাত্র। প্রায় ত্রিশ হাজার ছাত্রের এ প্রতিষ্ঠানটিতে আবাসিক সমস্যা ছিল খুবই প্রকট। তাই তিনি থাকতেন শহরের একটা মেসে। বর্নালী সিনেমা হলের পেছনে হেতম খা ছোট মসজিদ মেসে। আমি এসে উঠলাম তার কাছে। ভর্তি হলাম রাজশাহী কলেজে। কলেজের পুরনো ছাত্ররা তখনো কলেজ ছাত্রাবাস ছেড়ে যায়নি। তাই আমাদের থাকতে হতো বাইরে নিজেদের ব্যবস্থাপনায়। মফস্বলের স্কুল থেকে এসেছি শহরের কলেজে। স্বভাবতই ভেতরে ভেতরে মৃদু ভয়ের সঙ্গে কিছুটা থৃলও কাজ করছিল।

কলেজের প্রথম কয়েকদিন কাটলো বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনগুলোর দেয়া নবীনবরণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। অনুষ্ঠানগুলোতে অপূর্ব সুন্দরী কোনো সিনিয়র আপা আমাদের বরণ করে নিতেন আমাদেরই মধ্যে নির্বাচিত কাউকে রাখীবন্ধনের মাধ্যমে। তারপরে শুরু হতো সংক্ষিপ্ত বক্তৃতাপর্ব। কেননা অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণই ছিল বক্তৃতা পর্বের পরের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যাতে স্থানীয় সঙ্গীত শিল্পীরা পরিবেশন করতেন জনপ্রিয় সব গান। তখনো সঙ্গীতের প্রচলন হয়নি রাজশাহীতে। তবে গায়ের ছেলে এই আমি মুগ্ধ হয়ে শুনতাম ছাত্রনেতাদের জ্বালাময়ী কণ্ঠের বক্তৃতামালা। এসব বক্তৃতায় বহুবার উচ্চারিত হতো রাজশাহী কলেজের সমস্যাগুলোর কথা। নানান প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সমস্যা সংকুল এ কলেজটির শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে নবাগতদের সমর্থন আদায়ের কথা। ব্যাপারটা এ রকম যেন আমাদের সমর্থন পেলেই তারা সকল সমস্যা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবেন।

এদিকে হেতম খা মেস থেকে কলেজে আসতে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিলাম। কলেজ থেকে মেসের দূরত্বটা কিছু বেশি হলেও খরচ সীমিত রাখতে হেটেই ক্লাসে আসতাম। রোদের মধ্যে পুরু লেন্সের চশমা নিয়ে হাটাহাটি করতে কিছুটা বিড়ম্বনার শিকার হলাম। বেশি পাওয়ারের চশমার জন্য খালি চোখে ঠিকমতো দেখতে পেতাম না। আবার চশমা চোখে রোদ্রে হাটতে গিয়ে চোখে ব্যথা অনুভব করতে থাকলাম। বাধ্য হয়ে শরণাপন্ন হলাম চক্ষু চিকিৎসকের।

তিনি রোদে চলাফেরার সময়ে লেন্সের উপরে আলগা ফ্রেমে কালো সানগ্লাসের কাচ লাগানোর পরামর্শ দিলেন। ডাক্তারের পরামর্শ মতো চশমায় কালো কাচ লাগিয়ে আমার চোখের আরাম হলো বটে। কিন্তু সামনে হাজির হলো বিশাল এক বিপদ।

রাজশাহী কলেজের ক্যাম্পাসটা মোটামুটি বেশ বড়। ক্যাম্পাসের বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে থাকা ভিন্ন ভিন্ন বিল্ডিংয়ে হতো আমাদের ক্লাসগুলো। ফলে একটা ক্লাস থেকে আরেকটা ক্লাসে যেতে হুড়োহুড়ি লেগে যেতো সামনের বেঞ্চগুলোতে বসার জন্য। কলেজের চৌহদ্দিতে পা রেখেই গজিয়ে ওঠা কিছু রোমিও চেষ্টা চালাতো সামনের সারির মেয়েদের বেঞ্চগুলোর ঠিক পরের বেঞ্চগুলোতে বসতে। উদ্দেশ্য জুলিয়েটদের দৃষ্টি আকর্ষণ অথবা বিভিন্ন কায়দায় তাদের উত্যক্ত করা। সিরিয়াস ছাত্ররা চাইতো ওই একই বেঞ্চগুলোতে দখল নিতে যাতে শিক্ষকদের কথাগুলো ঠিকমতো শোনা যায়।

কলেজে এসেছি সবেমাত্র সপ্তাহ খানেক। এখনো আমাদের মধ্যে তেমন বন্ধুত্ব গড়ে ওঠেনি। সেদিন প্রথম ক্লাস ছিল ফিজিক্স গ্যালারিতে। হেটে আসতে কিছুটা দেরি হয়ে যাওয়ায় হন্তদন্ত হয়ে ক্লাসে ঢুকছি। কলিমউল্লা খানস্যারের ক্লাস। একদিনে যে কয়েকজন স্যারের নাম সকলের মুখে মুখে তারই একজন কলিমউল্লাস্যার। শুনেছি ভীষণ বদরাগী আর একগুয়ে স্বভাবের। বিপত্তিটা ঘটলো ঠিক তারই ক্লাসে। তাড়াহুড়োর জন্য চশমার কালো কাচগুলো না সরিয়েই সবেমাত্র এক পা ক্লাসের মধ্যে রেখেছি।

ভারী কণ্ঠে ভেসে এলো, এই যে ওস্তাদজি, রোদ চশমাটা খুলুন।

এতোটাই ভয় পেয়ে গেলাম যে, যন্ত্রচালিতের মতো আমার কালো কাচে ঢাকা পুরো চশমাটা খুলে দাড়িয়ে রইলাম। একে বাইরের কড়া রোদ থেকে আসা, তারপরে চোখে চশমা নেই। ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঠিক কি করবো বুঝে উঠতে পারছিলাম না। ঠিক তখনই ভেসে এলো শ্লেষভরা কণ্ঠের আদেশ।

কি দাড়িয়ে রইলেন যে? যান বসুন।

অতিরিক্ত নার্ভাসনেসের জন্য আরো একটা গুরুতর ভুল করে বসলাম। চশমা হাতে নিয়ে এগোতে গিয়েই হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। পড়বি তো পড় মালির কাধে। সামনের বেঞ্চে বসা এক মেয়ের উপরে। সে আর কেউ নয়, আমার গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র বরষা। সে কথায় পরে আসছি।

বরষা আমাকে বাউন্ডুলে ছেলে ভেবে নাকি ঘটনার আকস্মিকতায় তীক্ষ্ম স্বরে চিৎকার করে উঠলো। ক্লাসের প্রায় একশ ছেলেমেয়ের একশ জোড়া চোখ নিবন্ধ হলো আমার ওপরে। ঠিক সার্চলাইটের মতো।

কলিমউল্লা স্যার হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে তার স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ করে বসলেন। আমার কলার ধরে টেনে দাড় করিয়ে ধাক্কা মেরে আমাকে ক্লাস থেকে বের করে দিলেন। পেছন থেকে চিৎকার ভেসে আসতো থাকলো, গেট আউট রাস্কেল, আই উইল সি ইউ, ক্লাসের পর টিচার্স রুমে এসো।

অপমানক্লিষ্ট ভগ্ন হৃদয়ে বাইরে মাঠের মধ্যে এসে দাড়ালাম। অন্তরে ভয়, এরপরে না জানি আমার ভাগ্য কি অপেক্ষা করছে! ক্লাসের বাকি চল্লিশটি মিনিট আমার কাছে মনে হচ্ছিল যেন একেকটি বছর। একে ক্লাস ধরতে জোরে হেটে এসেছি, অন্যদিকে এতোগুলো ভয়ংকর ঘটনা। তৃষ্ণায় আমার ভেতরটা যেন ঠিক সাহারা মরুভূমি। আমি যে কলেজ ক্যান্টিন থেকে পানি পান করে তৃষ্ণা মেটাবো সে শক্তিও ততোক্ষণে হারিয়ে ফেলেছি।

ক্লাস শেষে গুটিগুটি পায়ে টিচার্স রুমে হাজির হলাম। দেখি কলিমউল্লাস্যার তার কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে উত্তেজিত ভঙ্গিতে কথা বলছেন। বোধ করি আমাকে নিয়েই। আমাকে দেখেই তিনি অগ্নিশর্মা হয়ে বকতে শুরু করলেন কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই।

তার একেকটা বাক্য যেন অগ্নিশলাকার মতো আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করতে থাকলো, পাখা গজিয়েছে, না? কলেজে ঢুকেই মাস্তানি ইত্যাদি।

হয়তো বা বকাঝকার জন্য কথাগুলো তেমন ভারী কিছু নয়। কিন্তু এগুলোই আমার বুকে একেকটি শেল হয়ে বিধছিল। কেননা আহামরি গোছের ভালো ছাত্র না হলেও মফস্বলের স্কুলে ভালো ছাত্র হিসেবেই পরিচিত ছিলাম। আমার পনেরো ষোল বছর বয়সে কোনোদিনও আমাকে এ রকম কথা হজম করতে হয়নি। তাই আমিও খানিকটা মরিয়া হয়ে বলে ফেললাম, স্যার, মাফ করবেন, আমি দেখতে পাইনি।

এতো বড় গরুর মতো দুটো চোখ থাকতেও তুমি দেখোনি? ফাজলামি পেয়েছো?

স্যার, চশমা ছাড়া আমি ভালোমতো দেখতে পাই না।

আবারও ফাজলামো, সানগ্লাস ছাড়া তুমি দেখো না, আমাকে বিশ্বাস করতে বলো?

রাগ মানুষকে কতোটা অন্ধ করে তার প্রমাণ পেলাম স্যারের ব্যবহারে। তিনি এতোটাই রেগে গিয়েছিলেন যে, আমার পুরু গ্লাসের চশমাটা তার নজরেই এলো না।

তিনি তার সহকর্মীদের চিৎকার করে বলতে লাগলেন, দেখেছেন ছেলের সাহস? একে তো অপরাধ করেছে, তারপর মুখে মুখে তর্ক।

সে মুহূর্তে এতোটাই হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম যে, স্যারের ঠিক মুখের কাছে এসে এক ঝটকায় আমার পুরু লেন্সের চশমাটা খুলে তার চোখর উপরে ধরে বললাম, স্যার দেখেন, এ চশমাটা ছাড়া প্রায় কিছুই দেখি না। আর না দেখতে পেয়েই হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়েছিলাম। আমি ইচ্ছা করে কিছুই করিনি।

এতোক্ষণ যেন স্যারের হুশ এলো। তিনি ছো মেরে চশমাটা হাত থেকে নিয়ে নিলেন। কিছুক্ষণ তার মুখে কোনো রা নেই। তারপর সে এক দেখার মতো ব্যাপার। স্যারের ভাবান্তরটা এতো দ্রুত ঘটছিল যে, না দেখলে সেটাকে ঠিক বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয়। তার মেজাজটা যেন সপ্তম স্কেল থেকে প্রথম স্কেলে নেমে এলো। কণ্ঠে যেন ভৈরবী রাগিণীর সুর। মোলায়েম স্বরে বললেন, আরে তাই তো, এতো দেখি খুব হাই পাওয়ারের চশমা!

স্যারের এ কথা শুনে প্রায় কেদে ফেললাম। প্রায় এক নিঃশ্বাসে বর্ণনা করলাম আমার পাওয়ারওয়ালা চশমার সানগ্লাসে রূপান্তরিত হওয়ার উপাখ্যান। কথা শেষ করে স্যারের দিকে তাকিয়ে হাপাচ্ছি।

আমাকে অবাক করে দিয়ে এতো বড় একজন নামকরা শিক্ষক আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। কতোভাবে যে দুঃখ প্রকাশ করলেন তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। অনুভব করলাম, হিমালয়ের চূড়াসম ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন এক শিক্ষকের পিতৃসম আচরণ। আমাকে বললেন, চলো এক্ষুণি ক্লাসের সবার ভুল ভেঙে দিই।

এতোক্ষণ যেন আমি আমাতে এলাম। অস্ফুট স্বরে বললাম, স্যার পানি।

তিনি বেয়ারাকে দিয়ে পানি আনিয়ে দিলে এক নিঃশ্বাসে তা সাবাড় করলাম। কোনো রকমে বললাম, স্যার, আজকে থাক।

তিনি আমার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে বললেন, ঠিক আছে, আজ তুমি ক্লান্ত, কাল ফিজিক্স ক্লাসেই সবাইকে বলবো।

পরের দিন ক্লাসের সকলের প্রশ্নবোধক চাহনি থেকে বাচতে অন্য ক্লাসগুলো না করে প্রথমেই হাজির হলাম ফিজিক্স ক্লাসে। স্যার যথানিয়মে রোল কল শেষ করে আমাকে সামনে ডাকলেন।

সবাই হঠাৎ করে এতোটাই চুপ করে গেল যে, ঘরে তখন পিনপতন নীরবতা যেন জজ কোর্টে সবাই ফাসির আসামির রায় শুনছে।

স্যার সকলের সামনে আমার চোখের সমস্যার কথা বলে ঘটনাটি যে অনিচ্ছাকৃত তা বুঝিয়ে বললেন। মেয়েদেরকে বললেন আমার ওপরে না রাগ করতে। এমনকি সবার সামনেই ঘটনার জন্য আবার এক প্রস্থ দুঃখ প্রকাশ করতেও ভুললেন না।

পরের ঘটনাপ্রবাহ আরো চমকপ্রদ। ফিজিক্স ক্লাস থেকে বেরিয়েই উর্ধশ্বাসে রওনা দিয়েছি প্রাণী বিজ্ঞান ভবনে। লক্ষ্য প্রাণীবিদ্যার ক্লাস।

এই যে শুনুন।

পেছন থেকে নরম মেয়েলি কণ্ঠের ডাকে থমকে দাড়ালাম। ঘুরেই দেখি পেছনে দাড়িয়ে এক মেয়ে। সে আর কেউ নয়, আমার গল্পের নায়িকা। কণ্ঠে তার উষ্মা ছিল না বটে কিন্তু কো-এডুকেশনে অনভ্যস্থতায় আর অপরিচিত মেয়েদের সঙ্গে আলাপের অভিজ্ঞতা না থাকায় রীতিমতো ঘামতে শুরু করলাম।

এবার আরো এক অপরিসীম বিস্ময় আমার সামনে অপেক্ষা করছিল। মফস্বলের লাজুক কিশোর আমি, কোনো যুবতী তো দূরের কথা, অনাত্মীয়া কোনো মধ্য বয়সী নারীর দিকেও চোখ তুলে তাকাতে পারতাম না। সেই আমিই প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে বরষার দিকে তাকিয়েছি। আমার সকল সংকোচ, সকল ভয় আর দ্বিধা কোথায় যে কর্পূরের মতো উবে গেল তা জানি না। আমি অনেক দিন ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করেও তার কিনারা করতে পারিনি। আমি পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকে দেখতে লাগলাম। এতো ঘটনা যাকে নিয়ে সে বরষাকে আমি ভালো করে দেখিইনি। আজ যেন প্রথম বিশুদ্ধ পুরুষের দৃষ্টি নিয়ে দেখলাম পরিপূর্ণা এক যুবতীকে। খুব শাদাসিধে বেশভূষার বরষাকে আমার কাছে অপরূপা মনে হচ্ছিল। রাজ্যের সকল আড়ষ্টতা কাটিয়ে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম বরষার দিকে।

আমার তীব্র পুরুষালি চাহনিকে সইতে না পেরে, নাকি অপরিচিত কোনো পুরুষের সঙ্গে একাকী আলাপের অনভিজ্ঞতায় সে ক্রমেই কুকড়ে যাচ্ছিল। ঠিক যেন গ্রামের কোনো জঙ্গলের লজ্জাবতী লতার মতো।

আমার ভেতরেও অভাবনীয় পরিবর্তন অনুভব বোধ করতে থাকলাম। আমার অবচেতন মনের গভীরতা ছাপিয়ে অন্য কোনো সত্তায় অনুক্ষণ ধ্বনিত হচ্ছিল এ তোমার, এ তোমার। এতোদিন তোমার অবচেতন মনে যার ছবি খেলে যাচ্ছিল এই তো সেই নারী। কতোক্ষণ এভাবে ছিলাম বলতে পারবো না।

সংবিৎ ফিরে পেলাম বরষার ডাকে। কি ব্যাপার, আমাকে মাফ করবেন না? আমি তো আপনার মতোই বুঝিনি যে, যে...।

আমি উচ্চস্বরে বলে উঠলাম, ছিঃ ছিঃ, এ কি বলছেন? মাফ চাইবার কথা তো আমারই। কেউ কিছু অন্যায় করে থাকলে সে তো আমিই।

তারপরের ঘটনাগুলো দ্রুত ঘটতে থাকলো। দুজনে দুজনার অজান্তেই আমরা অনেক কাছে চলে এলাম। ক্লাস আর পড়ালেখার ফাকে আমাদের অভিসার চলতে থাকলো বিভিন্ন জায়গায়। টিউটরের কাছে যাবার অনুমতি

নিয়ে আমরা দুজনে চষে বেড়ালাম, কখনো কলেজ গেট তো কখনো পদ্মার পাড়, কখনো ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস তো কখনো পাবলিক পার্ক। রাজশাহী শহরের ছোট্ট গণ্ডিটা যেন আমাদের কাছে আরো ছোট হয়ে গেল।
এরপরের ঘটনাপঞ্জি খুবই সরল, অথচ খুবই মধুর। বরষা আজ আমার সকল কাজের প্রেরণা। দুটো ছেলেমেয়ে আজ সুন্দর পৃথিবীতে হাটি হাটি পায়ে ক্রমেই পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়ে উঠছে। হ্যা, আমার প্রিয়তম মানুষ বরষাই তাদের মা। পৃথিবীর সকল জল্পনা–কল্পনাকে মিথ্যা প্রমাণ করে আজও আমরা পরস্পরের প্রতি ততোধিক আকর্ষণ অনুভব করি। আজও বরষা নামে আমার ভেতরে জ্বলে ওঠে হাজারটা মোমবাতি, আন্দোলিত হতে থাকতে হাজারটা ঘণ্টা।

আবু ধাবি থেকে

অগত্যা

– বিলকিস বারী

এক আত্মীয়ের বিয়েতে বরযাত্রী যাচ্ছি। কনের বাড়ি গ্রামে। তাই বরযাত্রীদের জন্য একটি বাসও ভাড়া করা হলো।
নির্দিষ্ট দিনে খুব গুছিয়ে সেজে নিলাম। দামি একটি শাড়ি পরলাম। এটা তো জানার কথাই যে, বিয়ে বাড়িতে বরযাত্রীরা খুবই দর্শনীয় একটি বস্তু। সব সাজগোজ সেরে প্রায় সারা জীবনের সঙ্গী চশমাটাও পরে নিলাম। চশমাটা আমার সারা জীবনের সঙ্গী বললাম। কেননা এটি কবে কখন যে আমার চোখে উঠেছে তা আজ মনেও নেই।
যাহোক, যথাসময়ে বাসে উঠে একটি পছন্দ মতো সিট নিয়ে বসে পড়লাম জানালার পাশে যাতে বাইরের মনোরম দৃশ্যগুলো দেখে যাওয়া যায়।
বাস ছাড়লো এবং কিছুদূর যেতেই একটি ট্রাফিক জ্যামে আটকা পড়লাম। বসে থাকতে থাকতে যখন ধৈর্যের বাধ ভেঙে যায় তখনই জ্যামটা আস্তে আস্তে ছাড়তে শুরু করলো।
ভাবলাম যাক, বাকি যাত্রাটা বুঝি বেশ উপভোগ্য হবে।
কিন্তু বিধি বাম। হঠাৎ টের পেলাম একটা হাত আমার কান বরাবর খামচে ধরলো এবং ছো মেরে চশমাটা নিয়ে উধাও হয়ে গেল।
আমি হতবাক। একি হলো? আমার এতো দামি চশমা! বিয়ে বাড়িতে যাওয়ার সমস্ত ইচ্ছাটাই উবে গেল। কিন্তু ততোক্ষণে বাস ইঞ্জিনের সমস্ত জোর দিয়ে চলতে শুরু করেছে। অগত্যা কি আর করা!

মিরপুর, ঢাকা থেকে

স্বামীর আদর

– রাত্রি

আমায় দেখতে বর পক্ষের সবাই এলো। তারা আংটি পরিয়ে কথাবার্তা ফাইনাল করে যাবে। সন্ধ্যার দিকে বর পক্ষের লোকজন এলো। তাদের সঙ্গে বরও এসেছে। এক সময় আমাকে তাদের সামনে বসানো হলো। ভয়ে ভয়ে আমার গলার অবস্থা মরুভূমি তখন।
এক পর্যায়ে বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেল। তারা চলে যাওয়ার পর আমার ছোট ভাইবোনেরা বরকে নিয়ে খুবই ঠাট্টা করতে লাগলো। তারা বলাবলি করছে, বরের চোখে নাকি ভারী শাদা ফ্রেমের চশমা। তাতে বরকে নাকি আরো গম্ভীর দেখায়। তারা আমাকে বলতে লাগলো, আপু তোর জামাই কানা ইত্যাদি।

একদিন এলো সেই শুভ দিন যেদিন আমার বিয়ে হলো। রাতে বাসর ঘরে একা বসে আছি। কিছুক্ষণ পর সায়েম (আমার স্বামীর নাম) ঘরে ঢুকলো ও আমার পাশে বসলো। আমি তখন ভয়ে নীল হয়ে গিয়েছিলাম। জানি না অপরিচিত একজন পাশে বসাতেই এ রকম হয়েছিল কিনা।

এক সময় সে উঠে গ্লাসে ভরে পানি খেলো। অনর্থক গলা খাখারি দিল। তারপর বললো, রাত্রি, আজ মশারি না টানিয়ে ঘুমাতে হবে। কারণ ফুল দিয়ে ঘর ভরে ফেলেছে। তুমি কি পারবে ঘুমাতে?

আমি শুধু মাথা নাড়লাম।

তারপর সায়েম বললো, তাহলে চলো আজ শুয়ে পড়া যাক। তুমি নিশ্চয়ই খুব টায়ার্ড। আজ খুব কান্নাকাটি করেছো।

তখন আমার কষ্ট লেগেছিল।

তারপর দুজনেই ঘুমাতে গেলাম।

তখনো তার নাকের ডগায় চশমা লাগানো ছিল।

তৃতীয় দিন আমাকে আদর করে কাছে টেনে নিল। আমার এক অদ্ভুত ভালো লাগা ও অস্বস্তি কাজ করছিল তখন। যখন নিচু হয়ে আমার ঠোটে ঠোট রাখলো তখন তার চশমায় আমার ভ্রূতে খুবই ব্যথা পাই। তারপর আমি চশমা খুলে রেখে দিতেই দেখলাম সে অন্ধের মতো হাতড়াতে লাগলো।

ভয় পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার, কি হয়েছে?

সায়েম বললো, রাত্রি, আমি চশমা ছাড়া কিছুই দেখি না। কারণ ছোটবেলায় আমার টাইফয়েড হয়েছিল। তারপর থেকে চশমাই আমার অবলম্বন। তুমি চশমাটা আমাকে দাও।

আমার চোখ দিয়ে টপ টপ করে জলের ফোটা গড়িয়ে পড়লো। নিজের অজান্তেই চশমা বাড়িয়ে দিলাম তার দিকে। কিছু হলো না সেদিন। ঘুমিয়ে পড়লাম দুজনেই।

কয়েকদিন পর সায়েমকে বললাম, সায়েম, তুমি আজ চশমা খুলে আদর করবে। যখন চশমা লাগবে, আমাকে বলো। আমার হাতেই চশমা থাকবে।

সায়েম চশমা খুলে আমার হাতে দিয়ে বললো, ঠিক আছে, নাও।

তারপর সে আমার বুকে চুমু দিয়ে ঠোটে এগিয়ে আসতেই দেখি সে আমার কানের মধ্যে চুমু দিচ্ছে।

ভাবলাম সে বোধহয় কানেই চুমু দিতে চেয়েছে। তখন সে বললো, এই তোমার ঠোট কই?

তখন আমি ঠোট এগিয়ে দিলাম তার দিকে।

প্রথম প্রথম তার এ সব কাণ্ডকারখানা দেখে খুবই হাসি পেতো। কিন্তু এখন আর হাসি আসে না। চশমাতে প্রায়ই খুব ব্যথা পাই। সায়েম সহানুভূতি জানায় এবং প্রচুর কষ্টও পায়। কিন্তু করার কিছুই নেই তার। আমার সায়েমের জন্য আমি কষ্ট পাই মনে মনে।

আমার স্বামীর চশমা নিজ হাতে প্রতিদিন পরিষ্কার করে দিই। আমার স্বামীর এই সমস্যার কথা আমাদের বাড়ির কাউকে বলিনি। কারণ আমি চাইনি সায়েম ছোট হোক। সায়েম আমার ভালোবাসা। সে জন্য চশমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কেননা চশমা ছাড়া আমার স্বামীর আদর থেকে বঞ্চিত হতাম।

চশমা, তুমি দীর্ঘ দিন বেচে থাকো আমার স্বামীর জন্য যাতে প্রতিদিন, প্রতি রাত আমার স্বামীর গভীর ভালোবাসায় শান্তির ঘুম ঘুমাতে পারি তার চওড়া বুকে। সায়েমের কষ্টে আমি কষ্ট পাই। যদি চশমা না আবিষ্কৃত হতো তাহলে হয়তো সায়েমের কি হতো জানি না। ভয়েই আমার গা শিউরে ওঠে।

আমি সুখী আমার স্বামী ও চশমায়। ধন্যবাদ চশমা তোমাকে।

ঢাকা থেকে

ফ্রেশ চোখ

– নীলিমা আলিম কণা

ছোটবেলা থেকেই চশমার প্রতি আমার ভীষণ দুর্বলতা। বাবাকে দেখতাম, প্রতিদিন কালো মোটা ফ্রেমের চশমা পরে পেপার পড়ছেন। আর গোল্ডেন ফ্রেমের শাদা চশমায় মাকে কি সুন্দরই না দেখাতো!

ক্লাস নাইনে পড়ার সময় বড় ভাইয়ের চোখে সমস্যা দেখা দিল। ফলস্বরূপ চোখে উঠলো চশমা। এরপর কি এক অলৌকিক কারণে ক্লাস নাইনে ওঠার কিছু দিনের মধ্যেই বড় আপুর চোখটাও গেল।

চোখে মাইনাস পাওয়ারের ভারী চশমা পরে আপু তখন জ্ঞানী জ্ঞানী চেহারা করে ঘুরে বেড়ান। আমি তখন সবে ক্লাস ফোর–এ পড়ি। আশায় দিন গুণতে থাকি কবে নাইনে উঠবো! চশমা পড়বো। যেহেতু বড় আপু এবং বড় ভাইয়া দুজনেরই ক্লাস নাইনে উঠে চশমা লেগেছে তাই আমার ধারণা ছিল, আমার বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হবে না।

কিন্তু হায়! ক্লাস নাইন শেষ করে টেন–এ ওঠার পরও আমার চোখে কোনো সমস্যা দেখা দিল না। সব কিছুই ঝকঝকে পরিষ্কার দেখি। ততোদিনে চশমার জন্য প্রায় মরিয়া হয়ে উঠেছি। কি করি, কি করি! শেষে উপায়ান্তর না দেখে একদিন দাতে দাত চেপে মরিচ গোলা পানি চোখে দিলাম। কেউ টেরও পেল না। এদিকে আমার চোখ ফুলে লাল! অনবরত পানি ঝরছে।

মা তো ভীষণ অস্থির হয়ে গেলেন। হঠাৎ কি এমন হলো যে, এই অবস্থা? একে তো বাচ্চা, চোখটাই না শেষ পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যায়!

খুলনার সে সময়ের নামকরা চোখের ডাক্তার ডা. বাহাউদ্দীনের কাছে আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো। ডাক্তার প্রাথমিকভাবে চোখ পরীক্ষার পর আমার চোখে লেন্স লাগিয়ে নির্দিষ্ট দূরত্বে কিছু অক্ষর পড়তে বললেন।

বললাম, কিছুই পড়তে পারছি না।

এরপর তিনি বেশ কয়েকবার লেন্স পরিবর্তন করে পড়তে বললেন।

প্রতিবারই একই উত্তর দিলাম। আসলে আমি সব অক্ষরই পড়তে পারছিলাম। কিন্তু ডাক্তার যদি আমাকে চশমা না দেন সেই আশংকায় সত্য কথা বলিনি।

এরপর তিনি অত্যন্ত চিন্তিত মুখে টর্চ দিয়ে খুব ভালোভাবে আমার চোখ পরীক্ষা কররেন। তারপর আবার চোখে লেন্স দিয়ে অক্ষর পড়তে বললেন।

এদিকে বার বার না বলাটা খারাপ দেখায়। তাতে তিনি আমার বুদ্ধি ধরে ফেলতে পারেন ভেবে এবারে বললাম, পড়তে পারছি।

তিনি একই লেখার বার বার করে পড়া শুনলেন। এরপর আমার কাছে এসে মুচকি হেসে বললেন, মামণি তোমার চোখে তো কিছুই হয়নি। এতোক্ষণ এমন দুষ্টুমি করলে কেন?

ধরা পড়ার লজ্জায় আমার চোখে তখন জল টলমল। মাথা নিচু করে চুপ করে রইলাম।

মাকে ডাক্তার বললেন, আপনার মেয়ের মতো এমন ফ্রেশ চোখ খুব কমই দেখা যায়। চোখে বোধহয় কিছু পড়েছে। তাই এই অবস্থা। তবে এটা সাময়িক। বহু আকাঙ্ক্ষিত চশমার পরিবর্তে তিনি আমাকে কিছু ওষুধ এবং চোখের কয়েকটা ব্যায়াম প্রেসক্রাইব করলেন।

এরপর অনেক বছর পার হয়েছে। এখন আমি একটা কলেজে পড়াই। আজও আমার চোখ চশমা বিহীনই আছে।

খুলনা থেকে

অসম্মতি

– এম.ইউ সিকদার ইনু

ঘটনাটা ছিল ১৯৭৮–৭৯ সালের। তখন আমি ক্লাস টু–তে পড়ি। আমার কাগজ দরকার। আব্বা দুই টাকা দিয়ে বললেন কাগজ কিনতে। আমার সিনিয়র এক ফুপাতো ভাইকে নিয়ে বাজারে গেলাম। বাজারে ঘুরছি। ভালোই লাগছিল। হঠাৎ প্লাস্টিক সামগ্রীর একটা দোকান দেখে দাড়ালাম।

ফুপাতো ভাই আমাকে চশমা কিনতে বললেন।

বললাম, না, কাগজ কিনতে হবে। কাগজ না কিনলে আব্বা রাগ করবেন।

তিনি অনেক জোর করলেন।

এতে রাজি হলাম।

তার বয়স আমার থেকে চার পাচ বছর বেশি হবে। তিনি পরতে পারবেন সম্ভবত এ জন্যই তিনি জোর করেছেন। শুধু চশমা না একটা ঘড়িও কিনলাম। বেশ খুশি খুশি একটা ভাব চলে এলো।

ফুপাতো ভাইটাও খুশিতে গদ গদ।

সম্ভবত দেড় টাকা খরচ হলো। পঞ্চাশ পয়সা থাকলো। কাগজ আর কেনা হলো না। বাকি পয়সা দিয়ে চকোলেট কিনে খেতে খেতে বাড়ি এলাম। পথে দুজনে চশমা পরে রঙিন দুনিয়াটা আরো একটু রঙিন দেখলাম। ভালোই লাগলো।

বাড়ি এসে চুপচাপ থাকলাম। সন্ধ্যায় পড়তে বসলাম।

মা জানতে চাইলেন, কাগজ কোথায়?

কথা বললাম না।

আবার জানতে চাইলেন কাগজ কিনেছি কি না।

বললাম, না।

জানতে চাইলেন কেন।

বললাম, টাকা হারিয়ে গেছে।

রাতটা ফাকি দিয়ে কাটালেও সকালে ধরা পড়ে গেলাম। জানাজানি হয়ে গেল কাগজের টাকা দিয়ে চশমা কিনেছি। এবার বকার পালা। মনে মনে প্রস্তুতি নিলাম মার খাওয়া ছাড়া আর গতি নেই। কপাল ভালো মার খাওয়া থেকে বেচে গেলাম দাদির হস্তক্ষেপে।

মজার ব্যাপার হলো, চশমাটা বাড়ি আসার পথে দুজনার টানাটানিতে ভেঙে গিয়েছিল।

দুই.

এরপর দ্বিতীয় চশমা কিনি মাস্টার্স পড়াকালে। তখন কার্বন ফ্রেমের বেশ প্রচলন। মাথা ব্যথা হতো, ডাক্তারের পরামর্শক্রমে ফটোসান গ্লাস কিনে কার্বন ফ্রেমে লাগালাম। মাস্টার্স পাস করে একটা এনজিওতে চাকরি নিলাম। ফ্রেমটা পাল্টিয়ে অন্য একটা ফ্রেম নিলাম। যেহেতু মোটর সাইকেল ড্রাইভ করতে হতো, তাই নিয়মিত চশমা পরতাম। কারণ খালি চোখে ধুলাবালি খুব সমস্যা করে।

একদিন ফিল্ড থেকে ফিরেছি। বাম হাতে হেলমেট, ডান হাতে চশমা। অফিসে ঢুকেই দেখি একজন সিনিয়র আর.এম বসে আছেন। সালাম দিয়ে চশমাটা পকেটে রাখবো ঠিক তখনই তিনি আমাকে কি একটা প্রশ্ন করলেন। তার দিকে খেয়াল করতে গিয়ে নিচে পড়ে চশমাটা বাম নাকের কাছে একটু ভেঙে গেল। তার ওপর আমার খুব রাগ হলো। আমার শখের এবং জরুরি একটা জিনিস ভেঙে গেল। অথচ তিনি জানতে পর্যন্ত

চাইলেন না ওটা ভেঙেছে কি না। ওটা কিনেছিলাম বেকার অবস্থায় টিউশনির টাকা থেকে। তাই বোধহয় বেশি খারাপ লেগেছিল। এরপরও ওই ভাঙা গ্লাসসহ-ই ওটা পড়তাম। একদিন ওটাও হারিয়ে গেল।

বিকালবেলা ফিল্ডে গিয়ে চশমাটা পাশে রেখে একটা চায়ের দোকানের সামনে বসে চা খেয়েছি। রোদ কম ছিল। সন্ধ্যার দশ মিনিট আগে অফিসের দিকে রওনা দিলাম। এক কিলোমিটার পথ এসে চশমাটার কথা আমার মনে পড়লো। আবার মোটর সাইকেল ঘুরিয়ে ওখানে গিয়ে আর ওটা পেলাম না। বড়জোর পাচ মিনিট সময় হবে। এর মধ্যে আমার চশমাটা হাওয়া হয়ে গেল। মনটা খারাপ হয়ে গেল। সবার কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, কেউ কিছু বলতে পারলো না। এরপরও চশমা হারানোর ঘটনা ঘটেছে। তবে ওই চশমাটার জন্য যতোটা খারাপ লেগেছে ততোটা অন্য কোনোটার জন্য লাগেনি।

ওই চায়ের দোকানে চা খাওয়ার পেছনে অবশ্য অন্য একটা কারণ ছিল। দোকানটার সামনের বাড়িতে চাদনি (ছদ্ম নাম) নামে একটা মেয়ে ছিল। তার এক বোন জামাইয়ের সঙ্গে আমার ভালো পরিচয় ছিল। সে তার সঙ্গে আমার বিয়ের প্রস্তাব দেয়। মূলত তাকে দেখার জন্যই ওখানে বসে চা খাচ্ছিলাম। ওই দিন দেখা হয়েছিল কি না ঠিক মনে নেই। তবে ওই দিন ছাড়া দুই একবার দেখেছি। তার একটা অবিবাহিত বড় বোন ছিল। তার বাবা চেয়েছিল বড় বোনটার সঙ্গে আমার বিয়ে হোক। তিনি অফিসে দুই একদিন খোজও নিয়েছিলেন। আমি সম্মতি দিইনি। কিছু দিন পরে চাকরিটা ছেড়ে দিই। আর খোজ নিইনি। হয়তো তাদের বিয়ে হয়েছে। কিন্তু আমার চশমাটার কথা আজও মনে পড়ে।

ঝালকাঠি থেকে

চাওয়া পাওয়া

– পরশ

চশমা পরার শখ সেই ছোটবেলা থেকে। দূরদর্শনে মহাত্মা গান্ধীর চোখে অদ্ভুত গোল ফ্রেমের চশমা দেখে মনে হয়েছিল, ওই চশমা পৃথিবীতে সবচেয়ে দুর্লভ ও মূল্যবান। ইচ্ছাটা আরো প্রবল হলো বড় ভাইকে চশমা নিতে দেখে। আলট্রনের তৈরি খয়েরি রঙের চশমাটা ছিল অনেক পাওয়ারফুল। তাই তো চশমাটা চোখে দিতে গিয়ে বাবার বকুনি খেতে হয়েছিল। পাওয়ারফুল চশমায় নাকি ছোটদের মাথা ঘোরে। আদি পিতা ও মাতা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত নিষিদ্ধ ফল খাবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা আর অন্যদিকে *মাথা ঘোরা* জিনিসটা কি তা জানার অদম্য কৌতূহল।

কিন্তু ভাইয়াটা যে কি, চোখ থেকে চশমাটা নামাতেই চান না। আর নামালেও রাখেন আমার নাগালের বাইরে। দিন দিন আমার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হতে লাগলো। অবশেষে সুযোগ এসে গেল। ভাইয়া তড়িঘড়ি করে ব্যাটিং করতে যাবার সময় চশমাটা আমার হাতে দিয়ে গেলেন। আমার হাতেই চশমা! সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে মোটেও দেরি করলাম না। কিন্তু মনে হচ্ছে চশমাটা পরার পর একটু ঝাপসা দেখছি। নিচের দিকে তাকাতেই দেখি এক পাশের ঘাস অন্য পাশের চেয়ে একটু কাছে।

হিসাব করে পা ফেললাম ঠিকই কিন্তু তারপরের কোনো কিছুই আর মনে করতে পারলাম না। নতুন এক অভিজ্ঞতা হলো। বুঝলাম আমার মাথা ঘুরেছিল। ভাইয়ার তো এমন হয় না? চোখের অসুখ না হলে আমার চশমা পরা হবে না তাহলে? আমার বিশ্রী রকমের ভালো শরীরটাতে চোখের অসুখ কিভাবে বাধানো যায় এই নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলতে লাগলো।

রোজ স্কুলে যাবার পথে বিভিন্ন লোকের চশমা পরা দেখে মনটা খারাপ হয়ে যেতো। চশমা পরে কতো বড় লাগে! আবার কাউকে জ্ঞানী বলে মনে হয়। কিন্তু কতো মোটা চশমা পরা মিজু দেখি সহজে কোনো পড়া বলতে পারে না। তারপরও বেশ লাগে তাকে ওই চশমাতে।

আমার চোখেও চশমা দিতে হলো স্কুল জীবন শেষে। এক অসুখ হলো যার কারণে একটানা কিছু সময় পড়তেই চোখের পেছনটাতে ব্যথা হতো। চোখের ব্যথার জন্য ডাক্তারের কাছে গেলাম। দেরিতে যাবার জন্য কিছুক্ষণ কথা শোনার পর অবশেষে সেই অতি আকাঙ্ক্ষিত চশমা।
মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ পাওয়ারের চশমা দিয়ে আমার শখ পূরণ হলো কল্পনার সঙ্গে বিস্তর এক পার্থক্য রেখে। নাকের গোড়ায় দাগ হওয়া, ব্যথা করা, কানের লতি চুলকানো ইত্যাদি নানান সমস্যা দেখা দিল। সমস্যার কথা বাসায় জানাতেই হালকা ফ্রেমের ব্যবস্থা হলো। কিন্তু চারচোখা, কানা ইত্যাদি কথা শোনা, চশমা হারানো, ভাঙা এই সমস্যাগুলোর কোনো সুরাহা হলো না। তারপরও আমার শখের তালিকার শীর্ষে রইলো চশমা।
খুব করুণ অবসান ঘটলো আমার এই চশমা প্রীতির। একই দলে ক্রিকেট খেলতাম সেই মিজু আর আমি। একদিন চশমা চোখে মিজু (চশমা ছাড়া সে বল ঠিকমতো দেখতে পারতো না) বল ক্যাচ করতে গিয়ে টুকরো টুকরো হলো তার চশমা। আঘাত পেল চোখে। দুই চোখ দিয়ে আমার বন্ধুটি আর কখনোই কিছু দেখবে না। অথচ আমার বলে ক্যাচ ধরতে না পারায় কতোই না গালমন্দ করেছিলাম মনে মনে।
হাসপাতালে তাকে দেখতে গিয়ে নিজের স্বার্থপরতার কথাই মনে পড়ছিল। মনে হয়েছিল আমার শখ আর বন্ধুর প্রয়োজন দুইয়ে মিলে কতো ভয়ংকর এক পরিণতির দিকে ঠেলে দিল। ঠিক অনুতাপে নয়, প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে বলে শখের চশমাটা আজ আর পরি না।

চট্টগ্রাম থেকে

গোমাই

– মোহাম্মদ জাকারিয়া আল মামুন

আট দশ বছর আগেও গ্রামে ছোটদের চশমা পরাটা দৃষ্টিকটু মনে হতো। এমনই এক গ্রামে আমার শৈশব ও কৈশোর কেটেছে যেখানে কলেজ পড়ুয়া ছাত্ররাও সানগ্লাস ব্যবহারে সংকোচ বোধ করতো। ফাকা রাস্তাতেই কেবল ওটা চোখে থাকতো। লোকজনের সামনে চালান হয়ে যেতো পকেটে।
১৯৯৪ সালের কথা। তখন সেভেনে পড়ি। স্কুল আমাদের গ্রাম থেকে পাচ কিলোমিটার দূরে। থানার একমাত্র সরকারি স্কুল। আমরা পাচ ছয়জন এক সঙ্গে সাইকেলে চড়ে স্কুলে যাতায়াত করতাম। আমাদের যাতায়াতের পথে পড়তো একটি বেসরকারি হাই স্কুল। ওই স্কুলের একটি মেয়ে আমাদের নজর কেড়েছিল। কারণ সে সানগ্লাস ব্যবহার করতো। আগেই বলেছি, চশমা সম্পর্কে গ্রামের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির কথা। তাই একটি মেয়ের চশমা পরাটা সবার কাছেই ছিল চরম বিস্ময়ের। খোজ নিয়ে যখন জানলাম মেয়েটিও সেভেনে পড়ে তখন মনে হলো মেয়েটির কি লজ্জাও নেই!
আমরা যারা দল বেধে স্কুলে যেতাম তার মধ্যে আমি ছিলাম একটু ভীরু প্রকৃতির এবং লাজুক। আর মিঠু ছিল সবচেয়ে সাহসী। মুখে প্রায় কিছুই আটকায় না। দেখা হলেই মেয়েটিকে *গোমাই* বলে খেপাতো মিঠু। গোমাই আমাদের আঞ্চলিক শব্দ। এটা দিয়ে গরুর মুখ বন্ধ রাখা হয়।
মিঠুর দেখাদেখি অন্যরাও নানান কথা বলতো। কেউ বলতো, গোমাই–এর দাম বেড়ে গেছে। কেউ আবার বলতো আমাদের গরুর গোমাই কিনতে হবে। অন্য কেউ হয়তো বলে উঠতো গরুর মুখে গোমাইটা একদম মানায়নি ইত্যাদি।
একদিন আমি আর মিঠু দুজনে স্কুল থেকে ফিরছি। অন্যরা নেই। পথে মেয়েটির সঙ্গে দেখা। সেদিন তার সঙ্গে ছিল আরো পনেরো বিশজন মেয়ে। মিঠু মুখ ফসকে গোমাই না বলে *ওই চশমা* বলে চিৎকার করে উঠলো। সঙ্গে বললো, চশমার দাম বেড়ে গেছে। কি করি? চশমা কিনতে হবে।

তার কথা শেষ না হতেই মেয়েগুলো মিঠুর সাইকেল ঘিরে তাকে নামতে বাধ্য করলো।

আমি ভয় পেয়ে পেছনে কি হচ্ছে তা না দেখার ভান করে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেলাম। কিছু দূর এগিয়ে সাহস সঞ্চয় করে আবার ফিরলাম। মিঠুকে বাচাতে হবে। কিন্তু গিয়ে যা দেখলাম তাতে আবার সাহস হারালাম।

মেয়েরা মিঠুকে মারেনি। তবে কোমরে বিশেষ কায়দায় ওড়না পেচিয়ে মারমুখি ভঙ্গিমায় জেরা করছে তাকে। ভয়ের ব্যাপার, কারো কারো হাতে স্যান্ডাল। কয়েকজন নানান প্রাণীর বাচ্চা বলে গালাগাল করছে। বলছে, বাপের টাকা থাকলে কিনে পর।

আমাকে দেখে আমার ওপরও কিছুটা ঝাল ঝাড়া হলো। তবে অল্পেই শেষ হলো। কারণ চশমা পরা মেয়েটাসহ কয়েকজন আমাকে চেনে থানার একমাত্র সরকারি স্কুলের ফার্স্ট বয় হিসেবে। ভবিষ্যতে এমনটি আর হবে না প্রতিশ্রুতি দিয়ে সে যাত্রা দুজনই রক্ষা পেলাম।

ব্যাপারটা যেখানেই শেষ হলো না। কিভাবে যেন সারা এলাকায় ছড়িয়ে পড়লো। অচিরেই জেনে গেল আমাদের স্কুলের ছাত্ররা। গ্রামের লোক সবাই ব্যাপারটা জানে। মুশকিল হলো যা ঘটেছে জানাটা তারচেয়েও বেশি।

দেখা হলেই বন্ধুরা দুঃখ প্রকাশ করে বলে, শেষ পর্যন্ত মেয়েদের হাতে মার খেলি! তোরা ব্যাটাছেলে নাকি? কেউ কেউ প্রতিশোধ নেয়ার প্রস্তাব দেয়।

প্রতিশোধ অবশ্য পরোক্ষভাবে নিতে পেরেছিলাম। মেয়েটির নাম স্থায়ীভাবে গোমাই বা চশমা হয়ে গিয়েছিল। ওই রাস্তায় আমাদের স্কুলের ছাত্ররা বা গ্রামের অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা সবাই তাকে গোমাই বলে চেনে এবং দলে ভারী থাকলে ও সুযোগ পেলে সে নামে ডাকতেও ছাড়ে না।

কিছু দিনের মধ্যেই মেয়েটা তার নিজের স্কুলে গোমাই নামে পরিচিত হয়ে ওঠে।

আমি এখন রাজশাহী ইউনিভার্সিটির থার্ড ইয়ারের ছাত্র। এক বন্ধুর কাছে কিছু দিন আগে শুনলাম মেয়েটিও এখানে দর্শন বিভাগে পড়ছে। এখনো মেয়েটার নাম জানি না। ক্যাম্পাসে যদি কখনো দেখা হয়ে যায়, যদি তার চোখে থাকে সানগ্লাস, যদি নয় বছর আগের মতো বলে ফেলি *গোমাই* তাহলে মেয়েটির কি প্রতিক্রিয়া হবে? তাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করে।

রাজশাহী ইউনিভার্সিটি থেকে

পপসিআপা

– মোহাম্মদ সাইদ হোসেন

যখন হাই স্কুলে পড়ালেখা করতাম, হেলাল স্যারের কাছে আমরা বেশ কয়েকজন ছাত্রছাত্রী প্রাইভেট পড়তাম। সব স্যারদের বাড়ি স্কুলের পাশে হওয়াতে বিভিন্ন এলাকা থেকে ছাত্রছাত্রী স্যারদের বাড়ি এসে প্রাইভেট পড়তো। আমরা সবাই সকালে স্যারের বাড়িতে এসে প্রাইভেট পড়তাম। এবং অন্য স্যারদের কাছে সব ছাত্রছাত্রী বেশির ভাগ সকালেই প্রাইভেট পড়তো। তাই প্রাইভেট পড়তে যাওয়ার সময় এবং পড়া শেষে বাড়ি ফেরার সময় সবাই এক সঙ্গে মজা করতাম।

সব ছাত্রছাত্রীর মাঝে আমি একা ফ্যাশন হিসেবে চশমা ব্যবহার করতাম। তবে স্যারদের কাউকে অথবা মুরুব্বিদের দেখলে আগেই খুলে রাখতাম।

আমাদের পাশের গ্রামের পপসিআপাও আমাদের সঙ্গে প্রাইভেট পড়তে যেতেন। তবে অন্য স্যারের কাছে। পপসিআপা আমাদের সিনিয়র, এবং খুব ভালো মেয়ে। প্রয়োজন ছাড়া কারো সঙ্গে কথা বলেন না।

হঠাৎ করে একদিন পপসিআপা আমাকে বললেন, সাইদ, তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। তবে যদি তুমি মনে কিছু না করো।

সঙ্গে সঙ্গে বললাম, ঠিক আছে আপা, আপনি বলুন।

কথাগুলো শুনতে তোমার খারাপ লাগবে। তবুও তোমাকে বলবো, অনেক ছেলেরা মনে করে চশমা পরলে, চুল বড় রাখলে, মাস্তানি করলে অথবা চুল এক পাশে বড়, অন্য পাশে ছোট রাখলে মেয়েরা হয়তো তাদেরকে পছন্দ করে। আসলে সমস্ত ধারনাটা ভুল। এগুলো যারা করে তাদেরকে মেয়েরা ঘৃণা করে। মেয়েরা কোন ধরনের ছেলেদেরকে পছন্দ করে জানো? এমন একজন ছেলে যার চেহারা দেখতে ভালো না, অথচ ভালো ছাত্র, নরম, ভদ্র।

আপা আরো বললেন, কথাগুলোতে যদি তুমি কষ্ট পেয়ে থাকো, আমাকে ক্ষমা করো। এই বলে আপা চলে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে চশমাটা নদীতে ফেলে দিলাম। এবং তখন থেকে আর কোনোদিন চশমা ব্যবহার করিনি।

কুয়ালা লামপুর, মালয়শিয়া থেকে

কবি

– জ.ই. রুবেল

আমি তখন সরকারি মুজিব কলেজে ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্র। শখের বশে দুইশ টাকা দিয়ে একটি চশমা কিনলাম আমার পরিচিত এক দোকান থেকে। পরে জানতে পারলাম, এ ধরনের চশমার দাম নব্বই থেকে একশ টাকার উপরে কোনোক্রমেই নয়।

যাহোক, কবি নজরুলের মতো বাবরি চুল রাখার অভিপ্রায়ে মাথায় সপ সপ তেল দিয়ে মধ্যখান দিয়ে সিথি কেটে কলেজে আসতাম চশমাটি পরে। বুঝতে পারতাম যে, অনেকেই আমার এ উদ্ভট চলা দেখে হাসাহাসি করছে। আমার বন্ধুরা এবং স্যাররা প্রায়ই ঠাট্টা করতেন। তবুও কবি হওয়ার দুর্লভ বাসনায় তাদের ঠাট্টাকে ডোন্ট কেয়ার ভাব করে মনে মনে এই আত্মপ্রসাদ লাভ করতাম, যারা কবি তারা তো একটু ব্যতিক্রম হবেই।

একদিন চশমা পরে গেলাম আমার এক ক্লাসমেটের বাড়িতে। তার টেবিলে চশমা রেখে কথা বলতে বলতে অনেক সময় পার হয়ে গেল। তাই চশমাটি ভুলে রেখে চলে এলাম। চশমাটির কথা মনে পড়াতে পরের দিন আবার গেলাম তার বাড়িতে।

সে পুরোপুরি অস্বীকার করে বললো, চশমাটি সে দেখেইনি এবং চশমাটি আমি আনিনি। তার সঙ্গে অনেক কথা কাটাকাটির পর বিফল মনোরথে চলে এলাম। মনকে এই বলে প্রবোধ দিলাম, চশমাটি আর পাওয়া যাবে না।

এবার আমার চুল কেটে ফেললাম। মধ্যখান দিয়ে সিথি করা বাদ দিলাম। প্রায় মাস তিনেক পরে আমারই চশমাটি দেখলাম তার ছোট ভাইয়ের চোখে। না, বন্ধুকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিনি চশমা সম্পর্কে। শুধু মনের গভীর থেকে বড় ধরনের নিঃশ্বাস ফেললাম।

নোয়াখালি থেকে

২৯ এপৃল

– ইমরান ইউসুফ

১৯৯১ সালের ২৯ এপৃল চট্টগ্রামের সবাই কিছু না কিছু হারিয়েছে। আমাদের বাড়ি ছিল সমুদ্র থেকে মাত্র দুইশ মিটার দূরে। আমাদের বাড়ি ও আশপাশের কারো জানের ক্ষতি না হলেও মালের ক্ষতি হয়েছিল। সেটা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পুষিয়ে গিয়েছে।

২৯ এপৃলের পর আমি, নাহিদ, মুসলিম, এপেলো, খোকন, শেকু সবাই মিলে বসলাম যে, দেশের এই দুঃসময়ে আমাদের কিছু করা দরকার। তখন আমরা সবেমাত্র কলেজের গণ্ডি পেরিয়েছি। আমাদের আর্থিক সঙ্গতি তেমন নেই যে, বড় কিছু করবো। প্রস্তাব রাখলাম, যেহেতু আমরা সমুদ্র তীরে বাস করি, তাই আমাদের এই পাড়ে নিশ্চয় অনেক লাশ আসবে। আমরা যদি সেই লাশগুলো ভালোভাবে সৎকার করি তাহলে লাশের গন্ধে এখানে কলেরা ও ডায়ারিয়ার মতো রোগ-বালাই থেকে লোকজন রক্ষা পাবে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কিছু পুণ্য সঞ্চয় হবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে টাকার। এতো টাকা আমরা কোথায় পাবো! ঠিক করলাম, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে যাত্রাবাহী বাসগুলো থামিয়ে চাদা সংগ্রহ করবো। মাত্র দুই দিনে চোদ্দ হাজার টাকা সংগ্রহ করলাম।

১ মে প্রথম দুটি শিশুর লাশ পেলাম। আমরা আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম, প্রতিটি লাশের সুরতহাল রিপোর্ট করবো এবং লাশের সঙ্গে যা কিছু পাওয়া যায় সেগুলো সংগ্রহে রাখবো। যদি কেউ কারো খোজে আসে তাহলে সুরতহাল রিপোর্ট ও প্রাপ্ত জিনিসগুলো দেখাবো যাতে লোকজন সহজে চিনতে পারে।

একটি শিশুর সঙ্গে কিছুই পেলাম না। অন্য শিশুর কোমরে ঝোলানো একটি তাবিজ পেলাম। উত্তরে ভাটিয়ারি থেকে দক্ষিণে পাক্ষার মাথা পর্যন্ত আমাদের কাজের সীমানা ঠিক করলাম এবং স্থানীয় লোকদের বললাম, যদি কোনো লাশের সন্ধান পান তো আমাদের ইনফর্ম করবেন।

২ মে আরো পাচটি লাশের সৎকার করলাম যার মধ্যে দুটি শিশু, একজন বৃদ্ধ, দুজন মহিলা। আমাদের দেখাদেখি গ্রামের আরো কিছু ছেলে এগিয়ে এলো সাহায্য করতে।

৩ মে স্থানীয় জেলেরা খবর দিল যে, তারা সমুদ্রে অনেক লাশ ভাসতে দেখেছে।

আমরা দেরি না করে একটা নৌকা নিয়ে গিয়ে পাচটি লাশ উদ্ধার করে ফিরে এলাম। তার মধ্যে একজন বৃদ্ধার গলায় ঝোলানো একটা চশমা পেলাম যা চুলের সঙ্গে প্যাচানো।

১০ মে পর্যন্ত এমন করে আমাদের মিশন চললো। মোট ২৩টি লাশ সৎকার করলাম আমরা।

আগে স্থানীয় লঞ্চঘাটে বলে রেখেছিলাম, কেউ যদি কোনো মৃত আত্মীয়ের খোজে আসে তাহলে যেন ফৌজদারহাটে গিয়ে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে।

বেশ কয়েকদিন পর এক লোক এলো আমাদের কাছে। বেশ-ভূসায় মনে হলো কিছু দিন শরীরের প্রতি কোনো খেয়াল রাখেনি।

লোকটি বললেন, ভাই, আমি একজন আমেরিকা প্রবাসী। ২৯ এপৃলের ঘূর্ণিঝড়ে আমার মা-বাবা সবাইকে হারিয়েছি। এখন সুদূর আমেরিকা থেকে এসেছি মা-বাবার খোজে। এমনকি আমার ভিটার চিহ্ন পর্যন্ত নেই। এই কয়েকদিন পাগলের মতো সবাইকে খুজেছি। কিন্তু কোথাও আমার মা-বাবার খবর পেলাম না। শুনেছি আপনারা কিছু মানুষের সৎকার করেছেন। সেই মানুষগুলোর যদি বিবরণ দেন তো বুঝতে পারবো তাদের মধ্যে আমার মা-বাবা ছিলেন কি না।

নাহিদ নিয়ে এলো সব ফাইলগুলো। সঙ্গে যে সকল জিনিস পাওয়া গিয়েছে সেসব কিছু।

হঠাৎ লোকটির চোখ গেল নয় নাম্বার প্যাকেটে রাখা চশমার দিকে। গোল্ডেন রিমের Sting-ব্র্যান্ড চশমা। সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারলেন এই চশমা তার মায়ের। যা তিনি মায়ের জন্য সুদূর আমেরিকা থেকে পাঠিয়েছিলেন। প্যাকেটটা বুকের মধ্যে জড়িয়ে অবতারণা করলেন এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের যা দেখে আমাদের সবার চোখে পানি এসে গেল। প্রায় এক ঘণ্টার মতো অঝোর ধারায় কাদলেন।

শেষে সান্ত্বনা দিয়ে তাকে নিয়ে গেলাম যেখানে আমরা লাশ দাফন করেছিলাম।

তার অবস্থা আরো খারাপ হলো। বার বার কবরের ওপর আছড়ে পড়তে লাগলেন। তারপর লোকটি তার মায়ের চশমা, কাপড়-চোপড়গুলো নিয়ে চলে গেলেন।

তিনি চলে যাওয়ার পর মনে পড়লো যে, আমরা তার নামটা পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়েছি। সেই দিনের পর থেকে কোনো মহিলার চোখে গোল্ডেন রিমের চশমা দেখলে আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে ২৯ এপ্রিল সেই ভয়াল রাতটির কথা। সঙ্গে সঙ্গে সেই লোকটির মা-বাবা হারানোর বেদনা ভরা দৃশ্যের কথা।

জেদ্দা থেকে

info@bahlas.com.sa

প্রথম

– চৌধুরী সাইফুল আলম

ঘটনার সঠিক তারিখ আজ মনে নেই। তবে সেটা ছিল ১৯৬৯ সালের অক্টোবর মাস। বেশ কিছু দিন যাবৎ চোখের সমস্যায় ভুগছিলাম।

একদিন বিকেলে আমার সাদুমামুকে সঙ্গে নিয়ে তখনকার বিশিষ্ট চোখের ডাক্তার আলীম চৌধুরীর কাছে গেলাম। তার চেম্বার ছিল দৈনিক বাংলা অফিসের কাছে। ডিসেম্বর ১৯৭১-এ ডা. আলীম চৌধুরী শহীদ হয়েছিলেন আল বদরদের হাতে।

সেদিন চেম্বারে রোগীর সংখ্যা ছিল অপেক্ষাকৃত কম। চার পাচজনের পরেই এলো আমার সিরিয়াল।

সাদুমামুকে নিয়ে ভেতরে ঢুকতেই ডা. আলীম চৌধুরী মৃদু হেসে নড করে বসতে বললেন। তারপর আমার চোখের সমস্যার কথা শুনে, বিভিন্ন যন্ত্রপাতি দিয়ে চোখ পরীক্ষা করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ইয়াংম্যান, তুমি একজন অপরাধী।

আমার তো তখন বিব্রত হওয়ার পালা।

পাশে বসা আমার সহজ-সরল সাদুমামু প্রতিবাদের সুরে বলে উঠলেন, না, না, ডাক্তার। ও ভালো ছেলে। কাউকে মারধর করেনি।

ডা. আলীম চৌধুরী আবারও জোর গেলায় বললেন, ও সত্যি অপরাধী। চোখের যত্ন নেয়নি। না হলে এমন হলো কি করে? চোখের যত্ন না নেয়া একটা অপরাধ।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার মতো ছেলেরা প্রায়ই চোখের বিভিন্ন সমস্যায় আমার কাছে আসে। তাদের দেখে আমার খুব খারাপ লাগে। এই বয়সে তোমাদের দৃষ্টি হবে ঈগলের মতো। ভালোভাবে দেখতে না পেলে এ দেশকে গড়ে তুলবে কেমন করে? এ দেশ তাকিয়ে আছে তোমাদের দিকে। আজ স্বাধিকারের দাবিতে সারা দেশ উত্তপ্ত। সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে এ দেশকে তোমাদের সঠিক লক্ষ্যে পৌছে দিতে হবে। এসব কিছুর জন্য প্রয়োজন শারীরিক সুস্থতা, চোখের সুস্থতাও এর অন্তর্ভুক্ত।

এই বলে তিনি প্রেসকৃপশন লিখতে শুরু করলেন।

ডা. আলীম চৌধুরীর আন্তরিক ভর্ৎসনা ও তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্যে তাকে আবিষ্কার করলাম নতুন রূপে। একদিকে তিনি বিশিষ্ট চোখের ডাক্তার, অন্যদিকে একজন দেশপ্রেমিক যিনি সস্নেহ আঘাতের মধ্য দিয়ে কর্তব্য বোধ জাগিয়ে তুলতে সচেষ্ট হন।

সেদিন ডা. আলীম চৌধুরীর হাতে প্রথম চশমা নিলাম।

ফিরে আসার সময় তিনি বার বার চশমাটি তৈরি হলে তাকে দেখিয়ে নিতে বললেন।

পরবর্তীতে অনেকবার চশমা পাল্টিয়েছি। নতুন পাওয়ারের চশমা নিতে কোনো চোখের ডাক্তারের কাছে গেলে আজও ডা. আলীম চৌধুরীর সেই স্নেহময় ভর্ৎসনা কানে সুরময় হয়ে বেজে ওঠে।

তেজগাও, ঢাকা থেকে

চারমিংমাতা

– মাহফুজ

চারমিংমাতা অর্থ সুন্দরী মা নয়, এর অর্থ হলো চশমা। মালয় ভাষা। কুয়ালা লামপুর মেট্রজায়া সুপারমার্কেটে বসে ফওজিয়া সেটাই আমাকে শিখিয়েছিল।

প্রায় বিশ বছর যাবৎ চশমা ব্যবহার করি। রাত জেগে পড়ার কারণে চোখের ডাক্তারের পরামর্শে চশমা ব্যবহার শুরু। আমার জীবনে চশমা নিয়ে সবচেয়ে আনন্দ ও বেদনা মিশ্রিত যে ঘটনাটি ঘটেছে সেটা হলো গত ১৯৯৭ সালের ১ এপৃল প্রবাসে।

মালয়শিয়া-র রাজধানী কুয়ালা লামপুর-এ তামান শ্যামেলিন, চেরাস-এ ছিল আমাদের ইলেকট্রনিক্স কম্পানি Trameat Electronics. আমরা টেলিফোন-এর পার্টস অ্যাসেম্বল করতাম। অতি সূক্ষ্ম কাজ, চোখের কাজ। হালকা ও সূক্ষ্ম কাজ বিধায় এখানে বাংলাদেশি বাদে এ দেশের শতকরা নব্বই ভাগ মেয়েরা কাজ করতো আমাদের সঙ্গে। অত্যাধুনিক এ দেশের বেশির ভাগ মানুষই কাজকর্ম ছাড়া যেমন কিছু বোঝে না তেমনি পোশাক-আশাকে ও প্রসাধনী ব্যবহারেও তারা যথেষ্ট সচেতন।

মোট কথা, পরিচ্ছন্ন নগরীর সঙ্গে তারাও পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি হয়ে থাকতে পছন্দ করতো। আমাদের সঙ্গে বেশির ভাগ শ্রমিক অত্যন্ত অভাবী ও গ্রামের বলে এদের কাছ থেকে তারা কাজ বুঝে নেয়া ছাড়া খুব একটা কাছে ঘেষতো না।

তবে আমি বা আরো কিছু ছেলেরা যারা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও আধুনিক সমাজে মানিয়ে চলতে অভ্যস্ত এদের সঙ্গে তারা বেশ স্বাচ্ছন্দ বোধ করতো। তাছাড়া অন্য সবার চেয়ে আমি ছিলাম ব্যতিক্রম। আমিই একমাত্র ব্যক্তি যে চশমা ব্যবহার করি ও অভ্যাসবশত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং পরিপাটি চলি। যদিও কারো নজর কাড়া আমার উদ্দেশ্য ছিল না তবুও আমাদের ফ্যাক্টরির সহকারী সুপারভাইজার ফওজিয়া নামের ছাব্বিশ বছর বয়সের মেয়েটি আমাকে যেন একটু অতিরিক্ত খাতির করতো। তাছাড়া ফওজিয়া অন্য বাংলাদেশিদেরকেও ভালোবাসতো এবং বাংলা ভাষার প্রতি ছিল তার প্রচণ্ড দুর্বলতা। এর প্রমাণ, তার বাংলা ভাষা শেখা ও বলার মাধ্যমে পরে বুঝেছিলাম, বিশেষ করে বাংলাদেশের দাম্পত্য জীবনের বর্ণনা শুনে সে ডুকরে কেদে ফেলতো। কারণ তারা অর্থ, ঐশ্বর্য, আরাম সব কিছু ভোগ করেও অসম্পূর্ণ থাকতো আর সেটা হলো *ভালোবাসা।* এখানে সব আছে, নেই শুধু আদি, অকৃত্রিম ভালোবাসা। তাই সে শত চেষ্টা করেও ধরে রাখতে পারেনি তার অতি প্রিয় ভালোবাসার মানুষটিকে।

অবশ্য গত ছয় মাসে আমার এদের সামাজিকতা বা ভাষা বেশ আয়ত্বে এসেছিল। কিন্তু ফওজিয়া যে কখন আমার ওপর ভর করেছে সেটা টের পেতে বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছিল। মাসের ৫ তারিখ বেতন যাবে ব্যাংকে। ৬ তারিখ থেকে টাকা তুলতে পারবো। কিন্তু ১ তারিখে হঠাৎ চশমাটার নাক বরাবর ভেঙে দুই টুকরো হলো। গ্লাস ভালো আছে, প্রয়োজন শুধু ফ্রেমের। কিন্তু হাতে বা ব্যাংকে যে টাকা আছে তাতে চশমা কেনা সম্ভব নয়। আর ধার করা আমার ধাতে নেই। অগত্যা চশমা ছাড়াই ফ্যাক্টরিতে গেলাম।

ফওজিয়া এসে বললো – *মাহফুজ, কেনাপপা আওয়া চারমিংমাতা টাডাপ্যাকাই* অর্থাৎ মাহফুজ, কেন তুমি চশমা ব্যবহার করছো না?

বললাম, *পতং* ভেঙে গেছে।

তখন সে বললো, *হারিইনি আওয়া পিগি কে.এল. নানতি আওয়া বিলি বারু চারমিংমাতা বোলেহ* আজকে কুয়ালা লামপুর গিয়ে একটা নতুন চশমা কিনবো, ঠিক আছে?

বললাম, *ছাইয়া ডুয়েট টাডা* আমার হাতে টাকা নেই।

সে একটা ভেংচি দিল এবং বললো *রোকো বোলেহ* সিগারেট তো চলে।

আমি একটু রাগ করে শব্দ করেই বললাম, *রোকো বোলেহ মিনুম রোলেহ* সিগারেট নয়, বিয়ার মদও চলে।

তখন সে ভীষণ রেগে চলে গেল।

বিধি বাম। ঘণ্টা দুই পরে চোখ থেকে জল পড়া শুরু করলো যেন মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত। রুমাল দিয়ে মুছে সামাল দিতে পারছি না।

এরই মাঝে মালয় সুন্দরী ফওজিয়া এসে আমার লাইন লিডার আসমাকে জিজ্ঞাসা করলো, *কেনাপপা দিয়ানাংগিছ* – কেন সে কাদছে।

সে উত্তর দিল, *আওয়া মারা* তুমি রাগ করেছো, সে জন্য বোধহয় কাদছে।

আমার পাশের চেয়ারে বসে ফওজিয়া বললো, প্লিজ *মাফকান ছাইয়া* আমাকে ক্ষমা করো।

হেসে বললাম, তোমার কোনো দোষ নেই। এমনিতেই জল ঝরছে। আবার চশমা পরলে ঠিক হয়ে যাবে।

ফওজিয়া উঠে সোজা আমাদের অফিস রুমে চলে গেল এবং পাচ মিনিট পর এসে আমাকে বললো, তোমাকে অফিসে চায়নিজ লেডি বস ডাকছেন।

আমি উঠে গেলে আমার জায়গায় সে অন্য একজনকে বসিয়ে দিয়ে বললো, আমি যতোক্ষণ না ফিরি সে ওখানে কাজ করবে।

বস বললো, তুমি ক্লিনিকে যাও, চোখ দেখাও।

বললাম, বস, আমার কোনো সমস্যা নেই। শুধু চশমার ফ্রেমটা কিনে গ্লাসটা সেট করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

তখন সে বললো, তুমি ফওজিয়াকে নিয়ে যাও। সে তোমাকে সব ব্যবস্থা করে দেবে।

ঘুরে দাড়াতেই সে আমার দিকে মিটিমিটি হাসি দিয়ে বললো, চলো।

দুই মিনিট হাটার পর বাস স্টপেজে বাস পেয়ে সোজা কে.এল চলে গেলাম। দশ মিনিটের পথ। এই দশ মিনিট ফওজিয়া যা বললো তার সারাংশ হলো, সে আমাকে খুব পছন্দ করে এবং বস-কে সে ম্যানেজ করে আমাকে নিয়ে এসেছে চশমা কিনে দেবে বলে।

মার্কেটে ঢুকে আমি বললাম স্মোকিং জোনে যেতে চাই স্মোকের জন্য।

সে তখন আদেশের সুরেই বললো, আগে চশমা কিনবো, পরে যা ইচ্ছা তা-ই করবো।

একটা দোকানে ঢুকে আমার গ্লাস দুটো দিলাম যে, ফ্রেমের মাপে কেটে সেট করতে কতো পড়বে দাম?

দোকানি বললো, দেড়শ রিংগিট।

আমি সোজা বের হয়ে এলাম এবং অন্য দোকানে গেলাম।

ফওজিয়া বললো, সে পছন্দ করবে।

কিন্তু সে চায় বেশি দামের, আমি চাই কম দামের। কারণ তাকে বেতন পেয়ে ফেরত দেবো। যে দেশে আপন বোন দশ সেন্ট (পিনজাম) ধার নেয় এবং ফেরত দেয়, সেই দেশে তিন চারশ রিংগিট কোনো হালকা বিষয় নয়। ফওজিয়ার ভালোবাসার গভীরতা সম্পর্কে আমি মোটেই অবগত ছিলাম না। প্রতিদিন বিভিন্ন প্রকার খাবার নিয়ে আসতো। সারাক্ষণ কাছে-পিঠে ঘুর ঘুর করতো। যদিও এ দেশে এটা দোষের কিছুই নেই তবুও আমি সর্বদা চিন্তিত দেশের কথা ভেবে। কম্পানির কাজকর্ম ও বেতন-ভাতার চিন্তা করতাম।

অবশেষে পচাত্তর রিংগিট দিয়ে সে একটা ফ্রেম পছন্দ করে। আধা ঘণ্টা পর ডেলিভারি দেবে।

ফওজিয়া আমাকে নিয়ে ম্যাকডোনাল্ডস-এ ঢুকলো। বার্গারের অর্ডার দিল। খেতে খেতে অনেক কথা বললো সে।

আমি শুধু নিষ্পলক তাকিয়ে সৃষ্টিকর্তার নিপুণ শিল্পকর্ম দেখছি এবং ভাবছি, সৃষ্টিকর্তা কতো নিপুণ শিল্পী কিন্তু কতো নিষ্ঠুর রসিক। এতো সুন্দর একটি মেয়েকে এতো ধনী একটি দেশে পাঠিয়ে তার অন্তরে তুষের আগুন

জ্বালিয়ে দিয়ে কি মজাই না সে পায়! একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো অজান্তে। বললাম, ওজি (সংক্ষেপে ওকে ওজি ডাকতাম), আমি তো দুই বছর পর দেশে ফিরে যাবো। তখন তোমার কি কষ্ট হবে?

সে বললো, পৃথিবীতে আমরা কেউ থাকবো না। অতএব তুমি যে কাল চলে যাবে না পৃথিবী ছেড়ে তা কি তুমি জানো? আমি যে একটু পর চলে যাবো না তা কি তুমি বলতে পারো?

হায়! এ যে আরেক আতেল। যাক, আতেলে আতেল চেনে।

সে আবার বললো সে জন্যই তো তোমাকে একটা ভালো গিফট দিতে চেয়েছিলাম, তুমি নিলে না। আমি তাকে বোঝাতে পেরেছিলাম মেয়ে, আমিও সেই ব্যক্তি যে ভোগের চেয়ে ত্যাগকেই বেশি পছন্দ করে।

চশমা পরার পর তার খুশি দেখে অনেকটা বোকা হয়ে গিয়েছিলাম। মানে তার কাণ্ড দেখে।

কি সুন্দর লাগছে তোমাকে! তুমি বুঝবে না মাহফুজ, তুমি কতো সুন্দর, ইত্যাদি বলে যাচ্ছে।

সবাই তাকিয়ে দেখছে, কেউ কেউ হাসছে।

চশমাটা অনেক যত্ন করে চিরদিনের জন্য পবিত্র এক নির্ভেজাল ভালোবাসার স্মৃতি হিসেবে রেখে দিয়েছি। ফওজিয়া আমার হৃদয়ে গেথে আছে। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুক ফওজিয়া।

দক্ষিণ আলেকান্দা, বরিশাল থেকে

রঙিন ধূসর

জীবনে প্রথম চশমা পরা, চশমা ছাড়া পরীক্ষা দিতে যাওয়া এবং আমার কারণেই ভাইয়ার চোখে অল্প বয়সে চশমা তুলে দেয়ার জন্য রয়েছে অম্লমধুর, সংকটময় আর করুণ অভিজ্ঞতা। ঘটনাগুলো ক্ষুদ্র মনে হলেও এর গুরুত্ব কম নয়।

এক. এমন সে শয়তান, নাকে বসে ধরে কান, স্যার, বলেন দেখি এই ধাধাটির মানে কি?

আমার জীবনের প্রথম ও শেষ ছাত্র সুমন আমার চোখে চশমা দেখতে পেয়েই প্রশ্ন ছুড়লো। গভীর মমতায় স্কুল পড়ুয়া সুমনের কান মুড়ে দিয়ে বললাম, শয়তান না, বল ফেরেশতা। এটার কল্যাণেই আপাতত চোখের যন্ত্রণা থেকে রেহাই পেয়েছি।

ভীষণ দুষ্ট। কিন্তু প্রচণ্ড মেধাবী এই ছাত্রটি এখন কমপিউটার সায়েন্স নিয়ে ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে।

দুই. রূপার সঙ্গে আমার পরিচয় যখন আমি থার্ড ইয়ারে। পাতলা ফ্রেমের চশমায় ডাক্তার মেয়েদের নাকি ভীষণ ভালো দেখায়। কিন্তু একে তো ডাক্তার হতে তার তখনো পাচ বছর বাকি, তার উপর স্কুল থেকেই সে চশমা পরে আসছে। তাই একটা বিশেষ নামে তাকে ডাকতাম।

আমার চোখে চশমা দেখে সে আমাকে পেয়ে বসলো। বাহ! এতো দিনে লাইনে এসেছেন।

চশমা নিয়ে এতো দিনের কৌতুক, বাকা কথাগুলোকে পুজি করে সে ভীমরুলের মতো আমাকে জেকে ধরলো। রূপার বাক্যবাণে ধরাশায়ী হলাম।

রূপা, তোমার বাবা-মা তোমার নাম রাখতে একটা বিরাট ভুল করেছেন। তোমার নাম হওয়া উচিত ছিল হীরা।

আমার কথায় রূপা রাজহাসের মতো গ্রীবা বাকিয়ে বললো, কেন, আমি হীরার মতো মূল্যবান, এ জন্য!

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলি, না, তুমি হীরার মতো শুধু মূল্যবানই নও, হীরার আরেকটা গুণ, কাচকে কাটার মতো ক্ষমতাও তার আছে।

হীরার মতোই মূল্যবান ছিল বুদ্ধিমতি রূপা। শুনেছি কোটিপতি প্রৌঢ় ব্যবসায়ী স্বামীকে নিয়ে সে বেশ ভালো আছে।

তিন. বি.সি.এস পরীক্ষার ভাইভা দিচ্ছি। আমার ভাইভা পরীক্ষার বোর্ডের চেয়ারম্যান বঙ্গবন্ধু হত্যার মামলার রায় প্রদানকারী অবসরপ্রাপ্ত জজ গোলাম রসূল। তিনি পি.এস.সি মেম্বার এবং পদাধিকার বলে একটি বোর্ডের চেয়ারম্যান। বঙ্গবন্ধু হত্যা রায়ের পরেই তিনি অবসরে যান এবং গত আওয়ামী সরকার তাকে পি.এস.সি-র মেম্বার নিযুক্ত করে। এখনো তিনি পাবলিক সার্ভিস কমিশনে দায়িত্ব পালন করছেন।

আরো তিনজন প্রফেসর, ডাক্তারের কাছে ভাইভা দিয়ে যখন উঠবো তখন মোটা ফ্রেমের চশমা পরা গোলাম রসূল আমার মূল কাগজপত্র নেড়েচেড়ে বললেন, আগে চশমা পরতে নাকি?

জি স্যার, পরতাম।

এখন পরো না?

না স্যার।

একদম পরো না?

একদম পরি না স্যার।

আমার অ্যাডমিট কার্ড, বি.এম.ডি.সি-র সার্টিফিকেট সব জায়গায় চশমা পরা ছবি। অথচ আমি পরীক্ষা দিচ্ছি চশমা ছাড়া। একেবারেই পরি না, এমনটা বলা কি ঠিক হলো!

সাইকোলজিস্ট মাথা ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকালেন।

সালাম দিয়ে বেরিয়ে এলাম।

মি. রসূল তার জীবনের শেষ রায়ে সব আসামিকেই ফাসির আদেশ দিয়েছিলেন। আমার ক্ষেত্রেও এমন কোনো রায় হলো না তো!

চার. ভাইয়ার সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ লেগে গেছে আমার। দুজনই তখন ক্লাস থৃ-তে। পাবনায় খালার বাসায় বেড়াতে গিয়ে হঠাৎ করেই যুদ্ধটা বেধে গেল। আমি দোতলার সিড়ি থেকে ঢিল ছুড়ছি, ভাইয়া নিচ থেকে। পারছি না মোটেও। কারণ তার হাতের নিশানা চমৎকার। আচ্ছাসে ঢিল খেলাম। এমন সময় আমার ছোটটি আমার হাতে তুলে দিল ভাঙা কাচের টুকরা। ভাবলাম, এটা দিয়ে একটা লাগাতে পারলেই জিতে যাবো। সত্যিই সে যুদ্ধে আমি জিতে গিয়েছিলাম। কিন্তু সারা জীবনের জন্য হেরে গেছি আমার বিবেকের কাছে।

আমার ছোড়া কাচের টুকরো সরাসরি গিয়ে আঘাত করেছিল ভাইয়ার বাম চোখে। আব্বু দ্রুত মেডিকাল কলেজে নিয়ে গিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে দুবার দেশ-বিদেশের প্রখ্যাত চিকিৎসকরা অপারেশন করেছেন। কিন্তু সবই বৃথা। ছোটবেলা থেকেই ভাইয়ার চোখে উঠে এলো ডার্ক গ্লাসের চশমা।

ভাইয়া দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়েছেন। তবু তাকে কেমন অসহায় লাগে মাঝে মধ্যে।

আমি নিজে একজন ডাক্তার। কখনো কখনো ভাবি, আমার একটা কর্ণিয়া দিয়েও যদি...। নাহ! তা দিয়েও সম্ভব না। কারণ ওই চোখ দিয়ে পৃথিবীর আলো তিনি কোনোদিনই দেখবেন না।

ভাইয়ার চোখের দিকে তাকালেই আমার রঙিন স্বপ্নগুলোর সঙ্গে ধূসর একটা রঙ এসে মিশে যায়। ভাইয়া হয়তো নিজেও তার রঙিন স্বপ্নগুলোকে গাঢ় সানগ্লাস দিয়ে ঢেকে রেখেই শান্তি খুজে পান।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ঢাকা থেকে

ভুলো মন

– নিজাম আহমেদ

সংযুক্ত আরব এমিরেটস সেনাবাহিনীতে কাজ করার সুবাদে ১৯৯৬ সালে সউদি আরবের হাফার আল বাতেন নামের স্থানে নয় মাস ডিউটি করার সুযোগ হলো। সেখানে এমিরেটস, কুয়েত, কাতার, ওমান, বাহরেইন এবং সউদির ক্যাম্পও ছিল।

আমার ডিউটিস্থলে কোনো বাংলাভাষী না থাকাতে প্রতি রাতেই চলে যেতাম পার্শ্ববর্তী সউদি ক্যাম্পে। সেখানে সিলেট জেলার এক লোকের সঙ্গে খুব খাতির জমিয়ে ফেলেছি। তাই রাতে অবসর সময়ে ঘণ্টা দেড়েক সেখানে সময় না কাটালে আমার ঘুমই আসতো না।

প্রতিদিন চোখে চশমা লাগিয়ে ওখানে যেতাম। আমার অভ্যাস অনুযায়ী সব সময় চশমাটা খুলে টেবিলের ওপর রেখেই আমরা পাশাপাশি চেয়ারে বসে গল্পে মেতে যেতাম। অবশেষে বিদায় নিয়ে আসার সময় পুনরায় চশমাটা চোখে লাগিয়ে নিজ ক্যাম্পে চলে আসতাম।

একদিন রাতে সেই সিলেটিভাইয়ের ওখানে গিয়ে আড্ডা শেষে আসার সময় আমার চশমাটা খুজে পেলাম না। মাঝে মধ্যে পাশের রুমেও গিয়ে বসি। তাই সেই রুমটাতেও খুজে দেখলাম। না, পেলাম না।

সেই সিলেটিভাইও মন খারাপ করে এদিক-সেদিক খুজতে লাগলেন। এক পর্যায়ে তিনি বললেন, আপনি তো সব সময় আমার এই টেবিলের ওপর চশমা রাখেন, এখন চশমা গেল কোথায়! আরো কয়েক মুহূর্ত খোজার পর হঠাৎ তিনি আমার প্রতি তাকিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন।

ওনার এমন হাসিতে কিছু না বুঝে লজ্জায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলাম।

পরক্ষণেই তিনি হাসি থামিয়ে আমার চোখের ওপর আঙুলের ইশারা করে বললেন, চশমা তো আপনার চোখেই আছে।

হঠাৎ এই ভুলো মনের দরুন লজ্জা পেয়ে হাবা হাসমত মার্কা হাসি দিয়ে *শুভরাত্রি* বলে সেদিনের মতো বিদায় নিয়ে নিজ ক্যাম্পে চলে এলাম।

আজ এতো বছর পরেও সেই ঘটনা মনে হলে আনমনে হাসি পায়।

ইউএই থেকে

বৃলিয়ান্ট

– জয়ন্ত সরকার জয়

লেখাপড়া শেষ হতে না হতেই ঈশ্বরের কৃপায় একটি সরকারি চাকরি হয়ে গিয়েছিল। তা অবশ্য কোনো মামার জোরে না, বরং মেধাতেই হয়েছিল। এ কথা অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। চাকরিটা হওয়ার পর বিশ্বাস করেছিলাম এখনো মেধার মূল্যায়ন আছে।

আমার পোস্টিং হয়েছিল বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের এক জেলায়। আমার কাছে একেবারেই নতুন সব কিছু। কোথায় যাবো, কোথায় থাকবো কিছুই ভেবে পাচ্ছিলাম না। চাকরিতে যোগদান করে আমার এক বন্ধুর বাসায় উঠলাম। আমার সেই বন্ধুটিরও আমার সঙ্গে চাকরি হয়েছিল। বন্ধুর বাসা থেকে অফিস করে আর অফিস শেষে বিকেলবেলা আমি এবং আমার বন্ধু মিলে বাসার সন্ধান করি। অবশ্য বাসা খোজার জন্য আমার বন্ধুর বাবাও আমাদেরকে সহযোগিতা করতেন। ব্যাচেলর বলে কেউ ভাড়া দিতে চাইতো না।

আমার বন্ধুর বাবা তার এক কলিগের বাসায় আমার লজিং ঠিক করে ফেলেছিলেন। কিন্তু সেই বাসায় এক ষোড়শী বালিকা থাকায় সেখানে থাকিনি। কারণ যে কোনো সময় অঘটন ঘটে যেতে পারে।

চার পাচ দিন বন্ধুর বাসায় থাকার পর আমার কর্মস্থলের প্রায় এক কিলোমিটার পশ্চিমে একটি বাসা দুই বন্ধু মিলে ঠিক করলাম। বাসাটি নতুন। তখন পর্যন্ত ইলেকট্রিসিটি যায়নি। বাসা ঠিক হওয়ার পরের দিন বন্ধুর বাড়ি থেকে একেবারে বিদায় নিয়ে অফিসে এলাম। অফিস শেষে বিকেলবেলা উঠলাম নতুন বাসায়। শুরু হলো নতুন করে সব কিছু করা এবং থাকার।

বাসায় উঠে প্রথম ও দ্বিতীয় দিন খুব ব্যস্ততার মাঝে কেটে গেল। কারো সঙ্গে পরিচয় হয়নি। তৃতীয় দিন আশপাশে মোটামুটি দুই তিন বাসার লোকের সঙ্গে পরিচয় হলো। সকলে অবশ্য ইসলাম ধর্মাবলম্বী।

পাশের বাসার একটি পিচ্চি মেয়ে কয়েকদিন পর আমাকে বললো, ভাইয়া, আপনার ধর্মের লোক সামনের কয়েক বাসা পর আছে। তাদের বাসার একটি ছেলের নাম আপনার নামে নাম।

নাম তার জয় (ছদ্মনাম)। সেদিন তাকে আর কিছু বলিনি। আমার বিশ্বাস ছিল, তাদের কাছে এই খবর অবশ্যই যাবে। বিধি বাম। যথাসময়ে খবর পৌছে গিয়েছে পিচ্চির মাধ্যমে। হ্যা বলে রাখি, পিচ্চির নাম বানু। বানু যে তাদের বাসায় বলেছে, সে আমাকে বললো।

সেদিন আমি বানুর কাছ থেকে সব কিছু শুনলাম। শুনলাম তাদের বাসায় তিন বোন যথাক্রমে সাথী, বীথি ও টুম্পা এবং এক ভাই নাম তার জয়। বোনগুলোর মধ্যে বড় দুই বোন খুব সুন্দরী। তুলনামূলকভাবে সাথী একটু খাটো।

বানুকে বললাম, তাদেরকে আমার বাসায় বেড়াতে আসতে বলবে।

বানু যথাসময়ে খবর পৌছে দিয়েছে। বাসায় ওঠা প্রায় দশ দিন অতিবাহিত হয়েছে। তাদের বাসার কাউকে এখন পর্যন্ত দেখিনি। কারণ সকালবেলা অফিসে যাই, সন্ধ্যাবেলা ফিরি।

সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার, হাফ অফিস। অফিস থেকে এদিন আর কোথাও যাইনি। কারণ আমার শরীরটা একটু খারাপ ছিল। অফিস থেকে ফিরে হাত মুখ ধুয়ে দুপুরের খাবার সেরে একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। এর মধ্যে কে যেন আমার দরজা নক করছে। আমি দরজা খুলে দেখি অপূর্ব সুন্দরী দুই মেয়ে এবং তাদের সঙ্গে পিচ্চি বানু। হ্যা বলে রাখা ভালো যে, বানু তখন ক্লাস থৃ-র ছাত্রী হলেও একেবারে ইচড়ে পাকা।

বানু আমাকে বললো, ভাইয়া, পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। এই হচ্ছে আমার দুই আপু সাথী ও বীথি। আপু এই হচ্ছে আমার ভাইয়া জয়।

পরিচয়ের পর সেদিন আর তেমন কোনো কথা বললাম না তাদের সঙ্গে শুধু লজ্জায়।

যাওয়ার সময় মেয়ে দুটি আমাকে মিষ্টি সুরে বলে গেল, দাদা, আমাদের বাসায় অবশ্যই বেড়াতে আসবেন।

আমি মাথা নাড়িয়ে বললাম, ঠিক আছে যাবো।

তারা যাওয়ার দুই দিন পর তাড়াতাড়ি অফিস থেকে ফিরে বানুর মায়ের সঙ্গে গেলাম তাদের বাসায়। বাসায় যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মা আমাকে বসার জন্য বারান্দায় একটি চেয়ার দিলেন। আমি বসলাম এবং তাদের মায়ের সঙ্গে কথা বললাম।

এর মধ্যে বীথি আমার কাছে এসেছে এবং কথা বলেছে সাথী আমার সঙ্গে কোনো কথা বললো না। শুধু উঠান ঝাড়ু আর হারিকেন পরিষ্কার নিয়ে ব্যস্ত আছে।

বীথির সঙ্গে কথা বলছি। এর মধ্যে তাদের মা নাশতা তৈরি করে ফেলেছে। নাশতা করছি আর গল্প করছি।

এর মধ্যে বীথি আমাকে বললো, আমার ভাই এবং আপনার নাম এক, তাই আপনাকে আমার ভাই বানাতে চাই।

আমি কিছু না বলে চলে এলাম। সেদিন থেকে ক্রমে ক্রমেই তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে শুরু করলাম। তাদের বাসায় ভালো মন্দ যা কিছু হোক না কেন, জয় ছাড়া তারা খায় না।

এভাবে কেটে গেল নতুন বাসায় যাওয়ার প্রায় পচিশ দিন। এর মধ্যে সাথী আমার কাছে মাফ চেয়েছে প্রথম দিন তাদের বাসায় গেলে যে, সে আমার সঙ্গে কথা বলেনি সেই জন্য।

সাথীর সঙ্গে অনেক বিষয়ে কথা হয়েছে। সাথী তখন ক্লাস নাইনের ছাত্রী। তার ইচ্ছা একটা চশমা পরা। চশমা পরলে নাকি ছাত্রছাত্রীদেরকে বৃলিয়ান্ট দেখায়। এই জন্য তার চশমা পরার শখ।

আমারও ইচ্ছা ছিল তাকে একটি চশমা কিনে দেয়ার। মনে করেছিলাম সেই বছর দুর্গা পূজার সময়ে কিনে দেবো। কিন্তু পূজার কিছু দিন আগে সামান্য বিষয় নিয়ে কথা কাটাকাটি এবং সেই থেকে দুজনের কথা বলা বন্ধ। তাই সেই বছর আর তাকে চশমা কিনে দেয়া হয়নি।

এভাবে মান–অভিমানের মধ্যে দিয়ে একটি বছর ঘুরে আবার এলো দুর্গা পূজা। এই এক বছরের মধ্যে বেশ কয়েকবার সাথীর সঙ্গে কথা বলা বন্ধ ছিল আমার। মাঝে মধ্যে বলতাম আবার সামান্য কিছুতেই বন্ধ। দুর্গা পূজার আগে বীথিকে বলেছিলাম, এবার তোমাদের দুই বোনকে (সাথী ও বীথি) কিছু কিনে দেবো। তোমরা কি চাও আমাকে বলবে। বীথির কথামতো তার পছন্দ মাফিক তাকে কিছু কসমেটিক কিনে দিলাম।

তখনো সাথী আমার সঙ্গে কথা বলে না। সে বীথিকে বলেছে, আমাকে টাকা দিতে বলিস, আমার ইচ্ছা মতো কিনে দেবো।

বলেছিলাম, কি নেবে আমাকে বললে কিনে দেবো, টাকা দেবো না।

বীথিকে সাথী বলেছে, আমাকে চশমা ও ঘড়ি কিনে দিতে বলিস।

যথাসময়ে বীথি আমাকে বলেছে।

আমার সঙ্গে বাজারে যেতে বলো তাকে।

সে দিনই সাথী, বীথি ও তার মাসহ বাজারে গেলাম। অনেক কিছু কেনা হলো। আমার নিজের জন্য তাদের অনুরোধে শার্ট–প্যান্ট কিনলাম। সাথীর সঙ্গে একই রিকশায়ই বাজারে গেলাম। তাও সে আমার সঙ্গে কথা বলেনি।

এবার ঘড়ির দোকানে গিয়ে তার পছন্দ মতো ঘড়ি কিনে দিলাম। বিভিন্ন ধরনের হিট মারা কথার ফলে সে আমার সঙ্গে ঘড়ির দোকানে কথা বললো।

এদিকে আমার পকেট দেখি খালি। কারণ সেদিন আমার ইচ্ছা ছিল না শার্ট প্যান্ট কেনা। বললাম, আজ আমার টাকা নেই, বাসা থেকে টাকা আনতে হবে। তাই আজ আর চশমা কেনা হবে না। আগামীকাল এসে কিনে দেবো বলে সামনের দিকে এগোতে লাগলাম।

এর মধ্যে সাথী হাত থেকে ঘড়ি খুলে ফেলে দিয়েছে। বীথিকে বলছে, যদি চশমা কেনা না হয় তাহলে সে ঘড়িও নেবে না, একই সঙ্গে বাচ্চা মেয়ের মতো কাদছে।

তাই বাধ্য হয়ে তার মাকে বললাম, আপনার কাছে টাকা থাকলে আজ চশমা কিনে দেন, আমি পরে আপনাকে টাকা দিয়ে দেবো।

সেদিন তার জন্য সুন্দর চশমা কেনা হলো। সে খুব খুশি। এদিন থেকে সে নিয়মিতভাবে আমার সঙ্গে কথা বলে। পূজার মধ্যে সে চশমা পরেছিল, দুজনে ঘুরেছি অনেক।

পূজার পর থেকে দুজনের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হতে থাকে। শুরু হয় গভীর প্রেম–ভালোবাসার। একে অপরকে খুব ঘনিষ্ঠ করে কাছে টেনে নিয়ে সুযোগ মতো আদর করি, চুমু খাই, বুকে মাথা রেখে শুয়ে থাকি, আরো অনেক কিছু।

এর মধ্যে সামান্য ভুল বোঝাবুঝিতে ভেঙে যায় আমাদের সম্পর্ক। এখনো সে চশমা পরে ঘোরে তাকে খুব সুন্দর লাগে।

সম্পর্ক ভাঙার পর তার সঙ্গে দেখা হয়েছে মাত্র একবার। তখন তার হাতে ছিল কালো ঘড়ি, পরনে ছিল কালো চশমা, চুলগুলো শ্যাম্পু করা কিসকিসে কালো। চোখে ছিল সেই চশমা। তাকে দেখতে অপূর্ব সুন্দর লাগছিল। কিন্তু কিছুই বলা হয়নি।

এখনো তার ভুল ভাঙার প্রতীক্ষায় আছি। কবে সেই চশমা পরে এসে আমাকে আদর করবে এবং ভালোবাসার কথা শোনাবে।

এখনো সেই চশমার টাকা তার মাকে দেয়া হয়নি। অবশ্য দিতে চেয়েছিলাম কয়েকবার, সে নিতে চায়নি।

ঠিকানাবিহীন

দশ ভাবনা

– জামাল

এক. গ্রামের ছেলে শহরের বিশাল সরকারি কলেজে ভর্তি হয়ে মেইন হস্টেলে সিট পেলাম মেধা তালিকায়। পড়ার টেবিলে বৈদ্যুতিক বাতি, তাও আবার একশ ওয়াট। ফল যা হওয়ার তাই হলো। ছয় মাসের মধ্যে মাথা ব্যথা। ডাক্তার, প্রেসকৃপশন এবং চশমা। সেটা ১৯৬৫ সাল। সেই যে কান মুচড়ে ধরলো আজ পর্যন্ত সেই সিন্দবাদের বুড়ো নামেনি। শুধুই বাড়ছে তার পাওয়ার। হয়তো শিগগিরই নামবে। সময় হয়ে আসছে অন্ধকার কুঠরিতে ঢোকার। ওখানে চশমা লাগে না।

দুই. ষাটের দশকের শেষাশেষি। বড় ভাই বিয়ে করলেন। ভাবী ক্লাস নাইন–এর ছাত্রী। দুধে–আলতা রঙ, সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী। আমার মা–বোনদের অনেকেই বৌ দেখে খুশি না। কারণ বৌ–এর চোখে হাই পাওয়ারের মোটা চশমা। কি অদ্ভুত বেমানান।

বিয়ের দ্বিতীয় দিনেই ভাবীর নাচ দেখলাম। পরে গল্পচ্ছলে বললেন চশমার কাহিনী। ক্লাস ফাইভে থাকতেই মাথা ব্যথা। ডাক্তার, প্রেসকৃপশন এবং চশমা। ভাবী কি খুশি! দশ বছরের সুন্দরী বালিকার চোখে সুন্দর চশমা। কিন্তু একি, চশমা চোখে দিলে যে কিছুই দেখি না। চশমা ছুড়ে ফেলে দিলেন।

বাবা মা জোর করে চশমা পরান।

পর মুহূর্তে ছুড়ে ফেলে দেন।

অগত্যা আবার ডাক্তারের শরণাপন্ন।

ডাক্তারের পরামর্শ, অনেক বাচ্চা চশমা পরতে চায় না। এক কাজ করুন, চশমার হান্ডল দুটা পেছন থেকে বেধে দিন। তাহলে আর খুলতে পারবে না।

যো হুকুম জাহাপনা!

তিন দিন যেতে না যেতে চোখ ফুলে, লাল হয়ে ঘা হয়ে যাওয়ার যোগাড়।

আবার সেই ডাক্তার।

তিনি বিরক্ত হয়ে চশমাটা পরীক্ষা করলেন। চোখ কুচকালেন, প্রেসকৃপশনটা চাইলেন। দেখে লাফ দিয়ে উঠলেন। এ কি করে সম্ভব! আমি লিখেছি শূন্য দশমিক পাচ পাওয়ার আর চশমা পুরো পাচ পাওয়ারের। দশগুণ পাওয়ার। ধরেন বেটা চশমা দোকানদারকে।

অনেক কিছুই হলো। কিন্তু ভাবীর চোখ দুটো প্রায় শেষ। চশমা দিয়েও বেশিক্ষণ পড়তে পারেন না। বড় ভাই এসে উদ্ধার করলেন। ভাবীকে আর পড়তে হলো না।

তিন. ১৯৮৫ সালের দিকে সুন্দর ও বেশ দামি গোল্ড প্লেটেড চশমার ফ্রেম মায়ের জন্য নিয়ে গেলাম জেদ্দা থেকে। মা আজও ওই ফ্রেমটার লেন্স লাগিয়ে পরেননি। কেন, তা জানি না। যত্ন করে রেখে দিয়েছেন।

কয়েকবার জিজ্ঞাসা করায় ফ্রেমটা নিয়ে এসে দেখিয়েছেন মাত্র।

কেসসহ চশমাটা মোটা পলিথিন প্যাকেটে সযত্নে রক্ষিত।

চার. এখন আমার ছয়টা চশমা। একটা সর্বক্ষণ ব্যবহারের, একটা অফিসের ড্রয়ারে স্পেয়ার, একটা কমপিউটার টেবিলে, একটা রিডিং টেবিলে, একটা মেইন্টেনেন্স টেবিলে, একটা সব সময় বৃফকেসে স্পেয়ার। এখন দশ রিয়ালে রেডিমেড চশমা পাওয়া যাচ্ছে লেটেস্ট মডেল, খুবই সুন্দর, বাড়তি হলো কেসটা, সেটাও আরো সুন্দর।

পাচ. আব্বার বয়স ৯৪ বছর চলছে। ১৯৩৮ সালে মিটফোর্ড থেকে পাস করা ডাক্তার। চশমা লাগে না। কেননা রেটিনা থেকে নার্ভটা শুকিয়ে গেছে। কিছুই দেখেন না।

ছয়. বড় ছেলে রেজার জন্য চশমা নিতে হয়েছিল আট বছর বয়সেই। ডাক্তার বন্ধুর থেরাপি ও যথাযথ ফলোআপে টিনএজ পার হতেই চশমা আর লাগে না। মর্ডান ও সিনসিয়ার চিকিৎসার ফল ফলেছে উত্তম।

সাত. গত বছর বেগম সাহেব চশমা নিয়েছেন। লেটেস্ট মডেল, হাই ফ্যাশন। দেখে সুন্দরই লাগছে ওই সুন্দর মুখে।

আট. ছোট ছেলেটা চশমা নিয়েছিল। কিন্তু এসএসসি পরীক্ষার আগেই দুবার ভেঙেছে, ফ্রেম ছাড়া কাচের ওপর ওই চশমা। তারপর আর বানায়নি।

নয়. ডাক্তার বলেছেন, প্রতি বছর চোখ টেস্ট করানো উচিত। বিশেষ করে যাদের চোখে কোনো প্রবলেম আছে।

দশ. রোদে কিছু ক্ষতিকারক রে (Ray) আছে। বিশেষ করে কড়া রোদে অবশ্যই UV protectionসহ চশমা ব্যবহার করা উচিত। কেননা রেটিনাটা খুবই সেনসিটিভ। ওটার যত্ন নেয়া দরকার।

সউদি আরব থেকে

ছবি

১৯৯৩–৯৪ সালের ঘটনা। আমি ও আমার আরো দুই বান্ধবী সুমি এবং মৌ তিনজনে মিলে ঠিক করলাম কোথাও ঘুরতে যাবো। ঠিক হলো নৌকায় করে ঘুরবো। কথা মতো কাজ।

নির্দিষ্ট দিনে তিনজনে যার যার বাসা থেকে বের হয়ে একটি দোকান থেকে ফিল্ম কিনে সেটা ক্যামেরায় ভরলাম দোকানের এক লোককে দিয়ে। সুমির সানগ্লাস ছিল না। তাই আমার ভাইয়ার একটি সানগ্লাস লুকিয়ে নিয়ে তাকে দিলাম। আমরা তিনজনে স্কুল ফাকি দিয়ে নৌকা ভ্রমণের উদ্দেশ্য বের হলাম।

নির্দিষ্ট জায়গায় পৌছানোর পর রিকশা থেকে নামার সময় সুমি পা পিছলে পড়ে গেল। এতে আমি ও মৌ খুব হাসলাম। তবে লুকিয়ে যেন সুমি রাগ না করে।

নৌকা ঠিক করলাম এক ঘণ্টার জন্য। ঘুরতে ঘুরতে একটি সুন্দর জায়গায় গিয়ে নামলাম। আমাদের তিনজনের চোখেই তখন সানগ্লাস ছিল। সেখানে ছবি তুললাম। খুব মজা করলাম। এভাবে আরো কিছুক্ষণ নৌকায় ঘুরলাম, ছবি তুললাম।

নৌকাতে ছবি তোলার জন্য আমি ও সুমি নৌকার ছই–এর সামনে এসে দাড়ালাম। মৌকে আমাদের ছবি তুলতে বললে সে সুমির দিকে তাকিয়ে খুব জোরে হেসে উঠলো। তার হাসি দেখে আমরাও না বুঝে হাসলাম।

সুমিকে মৌ বললো, তুই হাসছিস কেন?

তুই কি একটুও বুঝতে পারছিস না?

মৌ আমাকে সুমির দিকে তাকাতে বললো।

তাকিয়ে দেখলাম, সুমির চোখে সানগ্লাসের একটি গ্লাস নেই। সুমি না বুঝে এভাবে তাকিয়েই ছবি তুলতে চেয়েছিল। আমি তখন হাসবো, না কাদবো বুঝতে পারছিলাম না। কারণ ভাঙা সানগ্লাস নিয়ে বাসায় যাই কি করে! ভাইয়া খুব বকবে ভেবে মনটা খারাপ হয়ে গেল। তখন সানগ্লাসের একটি গ্লাস খোজার জন্য তিনজনেই ব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

পরে ভাইয়া অবশ্য তেমন কিছু বলেননি।

পরের ঘটনা আরো মজার। কারণ সেদিনের তোলা ছবিগুলোর একটাও ওঠেনি। এখন ঘটনাটা মনে পড়লে খুব হাসি পায়। জানি না ঘটনাটা এবং আমাকে সুমি ও মৌ–র মনে আছে কি না?

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ঢাকা থেকে

টাকা দুই হাজার

– আজাদ রাজু

দুই বছর আগে কোনো এক অলস দুপুরে আমি আর অর্পা হাটছিলাম এলিফ্যান্ট রোডে। হাটতে হাটতে অর্পার নজরে এলো এক অভিজাত দোকানের শোকেসে সাজানো দুই হাজার টাকা দামের রে–ব্যান- এর দিকে।

তার আবদার কিনে দিতে হবে। সুন্দরী প্রেমিকার এ আবেদন গ্রহণ না করে পারলাম না। পকেটে ছিল চাদা তোলা টাকা। চাদাবাজি করে নয়, বন্ধুরা সবাই মিলে দিয়েছিল কৃকেটের সরঞ্জাম কেনার জন্য। কোনো কিছু না ভেবেই সেটা দিয়ে প্রেমিকার কাঙ্ক্ষিত পণ্য কিনে নিজেকে ধন্য করলাম।

প্রেমিকা আমার তুষ্ট হলেও বন্ধুরা স্বাভাবিকভাবেই আমার ওপর রুষ্ট হয়েছিল। তবে আমাকে তারা বিশ্বাস করতো।

এ বিশ্বাসের মর্যাদা দেয়ার জন্য বাবার মানিব্যাগ থেকে দুই হাজার টাকা চুরি করে তাদের দিলাম। এ দিকে বাসায় বিশাল হাঙ্গামা, বাবা যতোবার হিসাব করছেন ততোবারই দুই হাজার টাকা কম পড়ছে।

মা বাবার সব জামা প্যান্টের পকেট চেক করছেন।

বাসার সবাই টাকা খোজায় ব্যস্ত।

বোনদের মধ্যে চোর ধরা নিয়ে আলোচনা চলছে। তাদের সন্দেহ বাসার কাজের লোক মনুমিয়ার ওপর। এ সন্দেহ আস্তে আস্তে প্রকট হচ্ছে। তাই মনুমিয়াকে উদ্ধার করা আমার কর্তব্য হয়ে দাড়ালো।

নিরুপায় হয়ে গেলাম খালার বাসায় সেখান থেকে মায়ের কথা বলে দুই হাজার টাকা ধার নিয়ে এলাম। টাকাটা এনে গোপনে বাবার হ্যান্ডব্যাগে রেখে দিলাম। এরপর কিছুক্ষণ এদিক সেদিক খোজার ভান করে বাবার হ্যান্ডব্যাগ থেকে টাকাটা বের করে সবাইকে টেনশনমুক্ত করলাম।

এরপর কিছু দিন বেশ ভালোই কাটলো এর মধ্যে পাড়ার বড় ভাই কুখ্যাত মাস্তান বিলুভাইয়ের কাছ থেকে দুই হাজার টাকা ধার করে খালাকে দিলাম। খালার দেনা শোধ করলেও বিলু মাস্তানের দেনা এক মাসেও যখন শোধ করতে পারলাম না। তখন সে হুমকি দিল, এক সপ্তাহের মধ্যে টাকা না দিলে আমার একটা হাত সে ভেঙে দেবে।

কোনো পথ খুজে না পেয়ে আমার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস জার্মানি থেকে বড় মামার পাঠানো রে-ব্যান সানগ্লাস যার বর্তমান বাজার দাম পাচ হাজার টাকা সেটা তাকে দিয়ে দিলাম।

মাস্তান বেটা জিনিস চিনতো। তাই আমাকে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে বলেছিল, খুশি হয়ে দিলাম।

ভেবেছিলাম ভোগান্তি বুঝি শেষ হলো। কিন্তু অশান্তি যে শুরু হয়ে গেছে তা বুঝিনি। কথায় কথায় খালার কাছ থেকে মা জানতে পারলেন যে, তার কথা বলে খালার কাছ থেকে টাকা এনেছি। শুরু হলো জেরা। পরিবারের সদস্যদের প্রশ্নবানে আমি জর্জরিত। ঘুরেফিরে একই প্রশ্ন, কেন টাকা নিয়েছি, টাকা দিয়ে কি করেছি?

আমার সত্য কথা বলার কোনো উপায় ছিল না। কিভাবে বলি যে, অর্পাকে সানগ্লাস কিনে দিতে গিয়ে এই অবস্থায় পড়তে হয়েছে।

তাই সত্য-মিথ্যা আর উপস্থিত বুদ্ধি মিলিয়ে সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। স্বস্তি পেলেও শাস্তি আমার ঠিকই হয়েছিল। বাবার পকেট থেকে টাকা চুরি আর খালাকে মিথ্যা বলার অপরাধে আমার কৃকেট খেলা নিষিদ্ধ হলো। অন্যদিকে পাড়ার ওই মাস্তান বিলুভাইয়ের কারণে এখন পথ চলা দায়।

কিছু দিন আগে আমার পনেরোশ টাকা দামের ঘড়ি নিয়ে গেছে। তারপর পঞ্চাশ টাকা দিয়ে বলেছে, খুশি হয়ে দিলাম।

এভাবে সে প্রায়ই এটা-ওটা নিতে লাগলো আর পঞ্চাশ টাকা দিয়ে বলে, খুশি হয়ে দিলাম।

পঞ্চাশ দিয়ে সে খুশি হয়। কিন্তু টাকাটা নিয়ে আমি খুশি হতে পারি না। এ কথা তাকে বোঝানোর মতো সাহস আমার নেই।

আমার জীবনটা পলকে নরকে পরিণত হলো যখন সে আমার কাছে দুই হাজার টাকা তার পাওনা হিসাবে চাইল।

বললাম, ওই দুই হাজারের বদলে তো রে-ব্যান দিয়েছি।

সে বললো, তার বিনিময়ে পঞ্চাশ টাকা দিয়েছি।

তার এ কথায় আমি এতোই অবাক হয়েছিলাম যে, পুরোপুরি নির্বাক হয়ে গেলাম। সে আবার হুমকি দিল, এ সপ্তাহের মধ্যে টাকা না দিলে হাত ভেঙে দেবো।

অসহায় হয়ে গেলাম মায়ের কাছে।

মা আমার কথা বিশ্বাস করলেন না।

বন্ধুদের কাছে ধার চেয়ে না পেয়ে নিরুপায় হয়ে গেলাম অর্পার কাছে। অর্পার কাছে টাকা ধার চাইবো কি, সে উল্টো আবদার করলো, তাকে আড়ংয়ের জামা কিনে দিতে হবে।

আমার সব কথা তাকে খুলে বললাম।

সে কিছুই বুঝলো না। বরং আমাকে রাগ করে তাড়িয়ে দিল।

রাগে, দুঃখে-অপমানে ঢাকা ছাড়লাম। গেলাম মামাবাড়ি যশোরে। মামার বাসায় ঢুকতেই ছয় বছরের মামাতো ভাইয়ের প্রশ্ন, ভাইয়া তুমি নাকি ফুপুর কাছ থেকে টাকা চুরি করেছো? ধরণি দ্বিধা হও, এ দুনিয়ায় কি কোনো জায়গা নেই যেখানে মান-সম্মান নিয়ে থাকা যাবে।

অপমান সহ্য করে মামার বাসায় দুই মাস কাটানোর পর যখন শুনলাম বিলু গ্রেফতার হয়েছে তখন ঢাকায় ফিরে এলাম।

ঢাকায় এসে অর্পার এক বান্ধবীর কাছে খবর পেলাম অর্পার বিয়ে হয়ে গেছে। রাগ হলো না, দুঃখ হলো না, কষ্ট হলো না। শুধু বুকের মধ্যে একটা শূন্যতা টের পেলাম যা আজো অনুভব করি।

ঠিকানা বিহীন

khalidazadraju@yahoo.com

সেতুবন্ধন

– শিকদার মোহাম্মদ নূরুল মোমেন

আমার আব্বা সত্তরঊর্ধ বয়সী যিনি এখন চোখে দেখেন শুধু চশমার কল্যাণে। আব্বার পুরনো চশমাটা পাচ সাত বছর ধরে দেখছি। এই দীর্ঘ দিনের আবর্তনে এর প্রাণ প্রদীপ নিভু নিভু। পরবর্তীকালে একদিন তা হাত থেকে ফ্লোরে পড়ে চোখে দেয়ার অযোগ্য হয়। বেশ কয়েকদিন চশমা ছাড়াই চলেন। বেড়াতে আসা সেজ আপুর মেয়ে এশার খেলনা জোড়া লাগানোর সুপার গ্লু দিয়ে আব্বা চশমার ফ্রেমটা জোড়া লাগালেন। আবারও সেটা পরতে শুরু করলেন।

আমরা ছয় ভাইবোন। বোনগুলো বড়। পাচজনের বিয়ে হয়ে গেছে। সবাই নিজেদের সংসার নিয়ে মহা ব্যস্ত। এ বাসায় তারা তেমন একটা আসার সুযোগ পান না। আব্বা-আম্মার সঙ্গেই আমার বাস।

আব্বা সরকারি পদস্থ কর্মকর্তা হয়েও শেষ জীবনের জন্য কিছু জমাননি। সম্ভবত টাকা-পয়সার শাদা-কালো রঙটা নিয়ে ভাবতেন। যা রোজগার করেছেন তা দিয়ে মেয়েদের লালন-পালন করেছেন, বিয়ে দিয়েছেন। নিজেদের সঙ্গে ছোট ছেলে অংশুর কথা ভাবেননি। অতি সরল স্বপ্নে শুধু ভেবেছেন আদরের ছোট ভাইটিকে পাচ বোনে মিলেই মানুষ করবে। কিন্তু পরবর্তীকালে বাবার সেই ধারণা সঠিক হয়নি।

পদে পদে ঠেলা-ধাক্কা খেয়ে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা জীবনটা কাটিয়েছি। এবার এমএসসি ফাইনাল দেবো। আমার চাইতে কম মেরেটের অনেক বন্ধু নন গর্ভমেন্ট প্রতিষ্ঠান থেকে বিবিএ, কমপিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা কমপ্লিট করে অলরেডি ভালো স্যালারির জবে জয়েন করেছে।

জীবন গড়া আমার লক্ষ্য। কখনো কখনো চার পাশটা দেখে প্রচণ্ড আহত হয়ে আব্বার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছি। আব্বাও অবশ্য সেটা টের পেতেন। মাঝে মধ্যে সিগারেট গাজা টানা, ফেনসিডিল গেলার কথাও আব্বার অজানা ছিল না। দিনে, সপ্তাহে কিংবা মাসে দুজনের দুই চারটার বেশি কথা হতো না। তবে প্রায়ই মাঝ রাতে কপালে কিংবা মাথার চুলে আব্বার হাতের ছোয়া ঘুমের ভানেই উপভোগ করি। তখন আব্বার অব্যক্ত অপরাগতা আমাকে অপরাধী করে। বাস্তবতার সঙ্গে নিজের দূরত্ব কমিয়ে আনতে চেষ্টা করি।

টিউশনি থেকে পনেরোশ টাকা পাই। টাকাটা হাতে পেতেই আমার ভেতরটা আনন্দে নেচে ওঠে। এখনই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন সম্ভব। আব্বা জীবনে মেয়েদের কথা ভেবে ভেবে হয়তো কোনোদিন ভালো কিছু পরেননি। তাই যাচাই–বাছাই করে সাতশ টাকায় ভালো মানের চশমার ফ্রেম কিনি।

বাসায় ফিরে আব্বার মুখোমুখি না হয়ে আম্মাকে বলি, আম্মা, টিউশনির টাকা পেয়ে আব্বার জন্য চশমার ফ্রেমটা কিনলাম। আম্মার হাতে আরো তিনটা একশ টাকার নোট দিয়ে বলি, ডাক্তার দেখিয়ে আব্বাকে চশমার গ্লাসে পাওয়ার অ্যাডজাস্ট করে নিতে বলো।

আম্মা আমাকেই এগুলো দিতে বলেন।

কিন্তু আমি রাজি হই না।

এর দুদিন পরে আম্মা রাতে খেতে দেয়ার সময় বলেন, রাতে তোর আব্বা তোকে একটু দেখা করতে বলেছে।

আমি হ্যা, না কোনো জবাব দিই না।

আম্মাও আর কিছু বলেননি।

নিজের রুমে ফিরে বিশ্লেষণ করতে থাকি। আব্বার মুখোমুখি হবো কি হবো না? অন্তর সত্ত্বাটা জানায়, অবশ্যই মুখোমুখি হবো। আম্মাকে রান্নাঘরে গিয়ে বলি, তুমি তোমাদের ঘরে যাও, আমি একটু পরে আসছি।

আমার কথা শুনে আম্মার চোখেমুখে আনন্দ দোল খেতে থাকে।

রুমে ঢুকি। আব্বা ইজিচেয়ারে চোখ বন্ধ করে হেলান দিয়ে শুয়ে আছেন, বুকের ওপর বোখারি শরিফের সপ্তম খণ্ড মেলা। আমি মাথা নিচু করে দাড়িয়ে আছি।

আম্মা আমার আসার কথা আব্বাকে জানালেন।

আব্বা চোখ মেললেন, বোখারি শরিফটা বন্ধ করে আম্মার হাতে দেন।

অংশু বাবা, বস।

আমি বিছানায় আম্মার পাশে বসি।

আব্বা বলতে থাকেন, বাবা, এ দুনিয়ায় কারো ওপর নির্ভরশীল হতে নেই। হলেই সে জায়গা থেকে সবচেয়ে বেশি আঘাত পেতে হয়।

আব্বার মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। সম্ভবত এর আগে কখনো এমনভাবে তাকাইনি।

আবারও বলা শুরু করেন। আমার একমাত্র ছেলেকে আমি অনেক সুযোগ–সুবিধা দিতে পারিনি। আমি এক অক্ষম পিতা। আব্বা এবার প্রসঙ্গ পাল্টে বলেন, তোর দেয়া চশমাটা পেয়েছি। তখনই এটা ব্যবহার করবো যখন আমার ছেলে তার অক্ষম বাবাকে নানান অভিযোগ থেকে মুক্তি দেবে। আব্বার চোখ দুটো অশ্রুতে টলমল, মার চোখও মুহূর্তে, আমার দুটোও...।

আব্বার বুকে আছড়ে পড়ে বলি, বাবার বিরুদ্ধে সন্তানের কোনো অভিযোগ থাকতে পারে না। আমি অনেক ভুল করেছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমি কাদতে থাকি।

আব্বা আমার চোখের জল মুছে দিয়ে বলেন, এই বোকা ছেলে, মাথা তোল। এখন দেখ, চশমাটা কেমন হয়েছে?

মাথা তুলে আব্বার মুখে তাকাই, নতুন চশমায় আব্বাকে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে।

আব্বা বললেন, আমি জানতাম তুই আমার ওপর রাগ করে থাকতে পারবি না। তাই গতকাল ডাক্তার দেখিয়ে চশমায় পাওয়ার সেট করে এনেছি।

আমি হাসি ভরা মুখে বলি, ঠিকই করেছেন।

আম্মার মুখটাও হাসিতে ঝলমল।

ঘুচে গেল পিতা-পুত্রের দীর্ঘ দিনের দূরত্বের ব্যবধান। একটা নির্জীব চশমাই হলো এই মহা মিলনের সেতুবন্ধন।

মিরপুর, ঢাকা থেকে

দামি

– হেলাল

একবার ঢাকায় গেলাম। উদ্দেশ্য, বিশেষ কিছু কেনা-কাটা। আমার কেনাকেটার তালিকায় ছিল একটি রোদ চশমা অর্থাৎ সানগ্লাস।

সানগ্লাস কিনতে গুলিস্তান গেলাম। প্রথমে ভেতরের দোকানগুলোতে দেখলাম। দুই একটির দামও জিজ্ঞাসা করলাম। কিন্তু যে দাম তারা চেয়ে বসলো তাতে দেখলাম আমার বাজেটের সঙ্গে তার তফাত আকাশ-জমিন।

অবশেষে ফুটপাথে চোখ পড়লো। সেখানে একপায়া স্ট্যান্ডের ওপর বাহারি চশমা সাজানো। পছন্দ করে একটির দাম জিজ্ঞাসা করলাম।

দাম চাইলো একশ আশি টাকা।

বললাম, পয়ত্রিশ টাকা।

লোকটি এক ঝটকায় চশমাটি কেড়ে নিয়ে আগের জায়গায় ঝুলিয়ে রাখলো।

আমি হাটা দিতেই পেছনে ডেকে বললো, *এই যে ভাই, আহেন।*

চশমার সঙ্গে হলুদ কাপড়ের এক টুকরা রুমালও পেলাম।

চশমাটি পরে কিছুদিন পোজপাজের সঙ্গে ঘুরে বেড়ালাম। কয়েকদিন পর দেখলাম চোখ টনটন করে।

গেলাম চোখের ডাক্তারের কাছে। চশমাটি দেখাতেই ডাক্তার ক্ষেপে গেলেন। আমর সামনেই টেবিলের ওপর কয়েক ঘা আছড়ালেন। বললেন, এতো আছাড় দেয়ার পরও ভাঙলো না কেন জানেন?

বললাম, কি জানি, মনে হয় দামি কাচ!

ডাক্তার বললেন, কাচ না ছাই! এটা এক জাতীয় প্লাস্টিক। আপানার এটি প্লাস্টিকের চশমা। এগুলো পরে ঘুরলে চোখে গ্লোকোমা হতো।

ডাক্তারখানা থেকে বেরিয়ে চশমাটি ট্রাকের চাকার নিচে ফেলে দিলাম। জি. আই তার দিয়ে বানানো ফ্রেম আর প্লাস্টিকের কাচ চোখের সামনেই মচমচ করে ভেঙে গেল।

ত্রিশাল, ময়মনসিংহ থেকে

কাচের দেয়ালে বন্দী

– দেওয়ান জালাল উদ্দিন চৌধুরী

ছোটবেলা থেকেই আমি শাক খাওয়া পছন্দ করতাম না। শাক মানে গাছের পাতা। আর গাছের পাতা খায় গরু-ছাগলে। তাই আমি যে গরু বা ছাগল নই এটা প্রমাণ করতেই শাক খেতাম না। আমি ছাড়া আমাদের ছয় সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের সবাই শাক খেতেন। অবাক ব্যাপার হলো, আমি শাক খেতাম না। কিন্তু আমার চোখে চশমা ছিল না। অন্যদিকে বাসার সবাই শাক খেতো। তাই হয়তো সবার চশমা ছিল। এ জন্য আমি দুষ্টুমি করে সবাইকে বলতাম, শাক খেলে কি হয়?

এর উত্তর হলো, শাক খেলে চশমা নিতে হয়। বাস্তব উদাহরণ আমাদের পরিবারের সদস্যরা।

চশমার প্রতি ছেলেবেলা থেকেই আমার একটা বিতৃষ্ণা ছিল। চশমা যারা পরতো তাদের আমার কাছে প্রতিবন্ধী তথা *চোখ প্রতিবন্ধী* বলে মনে হতো। ক্লাসে যারা চশমা পরতো তাদেরকে আমরা বন্ধুরা *কানা, চার ব্যাটারি, পণ্ডিত, বিদ্যাসাগর* ইত্যাদি বলে ক্ষেপাতাম। তাছাড়া পাশের বাড়ির বুয়েট থেকে পাস করা মনিরভাইয়ের শুধু চোখে কড়া পাওয়ারের চশমা থাকার কারণে বৌ না পাওয়ায় চশমার প্রতি আমার বিতৃষ্ণা আরো প্রবল হয়। চশমা না থাকার জন্যে বৌ পেতে সুবিধা হবে ভেবে ছেলেবেলায় আমার মধ্যে একটা গোপন গর্ববোধ ছিল। কিন্তু বড় হয়ে আমার এ গর্ববোধ আর রইলো না।

আমাদের বাসার সবাইকেই কলেজে ওঠার পর চশমা নিতে হয়েছিল। এটা অনেকটা অলিখিত নিয়ম হয়ে দাড়িয়েছিল। আমার বাবার কলেজে উঠেই ফার্স্ট ইয়ারে চোখে সমস্যা হয় এবং তিনি চশমা ব্যবহার করতে বাধ্য হন। আমার মাকেও কলেজে উঠেই চশমা নিতে হয়েছিল। বড় ভাই আর আমার বড় দুই বোনের ক্ষেত্রেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হলো না। ব্যতিক্রম হলো আমার বেলায়। আমি এইচএসসি পাস করে ফেললাম চশমা ছাড়াই। অনার্সও দিয়ে ফেললাম চশমা ছাড়া। কিন্তু মাস্টার্সে এসে ধরা খেলাম।

একদিন ফার্মগেটে *ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতাল*-এর সাইন বোর্ড দেখে নিতান্ত আগ্রহের বশেই ঢুকে পড়লাম। দশ টাকা দিয়ে টিকেট কিনে ডাক্তার দেখালাম।

ডাক্তার আমাকে টেস্ট করে চশমা ব্যবহার করার জন্য বললেন।

তাকে চশমা না দিয়ে কোনো চোখের ড্রপ বা ওষুধ দিতে বললাম।

তিনি রাজি হলেন না।

বাসায় এলাম। মনটা বেশ খারাপ হলো। ছেলেবেলায় বন্ধুদের কানা, চার ব্যাটারি ক্ষেপানো আমি কি না এখন নিজেই কানা হয়ে গেলাম! বাকিটা জীবন আমার চোখগুলোকে কাচের দেয়ালে বন্দী হয়ে কাটাতে হবে ভেবে খুব কষ্ট হচ্ছিল। এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলাম না।

পরের দিন আবার হাসপাতালের ওই ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করলাম। তাকে চশমার পরিবর্তে অন্য কোনো উপায় বের করে দেয়ার জন্য অনুরোধ করলাম।

ডাক্তার আমাকে ভালো ভাবে বুঝিয়ে বললেন কেন, আমার চশমা নেয়াটা জরুরি।

তার কথার মধ্যে যুক্তি ছিল। তাই তার যুক্তি মেনে নিয়ে চলে আসতে হলো।

এরই মধ্যে দুই তিন মাস চলে গেল। আমি কানা তথা প্রতিবন্ধী হওয়ার ভয়ে চশমা নিলাম না। একটা কাজে চট্টগ্রামে যেতে হয়েছিল। হঠাৎই মনে হলো চোখে সমস্যা হচ্ছে। বন্ধুদের পরামর্শে চট্টগ্রামের জামাল খান রোডের সারি সারি চশমার দোকানগুলোর একটাতে ফ্রেম পছন্দ করে চশমার অর্ডার দিয়ে এলাম।

দুই দিন পর চশমা আনতে দোকানে গেলাম। চশমা নিয়ে দোকানের বাইরে এসে চশমা চোখে দিলাম। অদ্ভুত অনুভূতি হলো। পৃথিবীটা আরো স্পষ্ট পরিষ্কার আর উজ্জ্বল হলো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটা ভেবেও কষ্ট লাগলো, আজ থেকে আমি কাচের দেয়ালে বন্দী হলাম হয়তো চিরদিনের মতো।

চশমা নিয়েছি আজ চার বছর হলো। কিন্তু সত্যি কথা হলো, আমি আজও এটাকে মেনে নিতে পারিনি। এখনো এটাকে বাড়তি যন্ত্রণা মনে হয়। নিজেকে কেমন বন্দী মনে হয় যেন আমি এক কাচের দেয়ালে বন্দী। কোনো সুন্দর বা অদ্ভুত জিনিস দেখলেই চশমা খুলে ফেলি। চশমার বন্দিত্ব থেকে মুক্ত হয়ে খোলা চোখে পৃথিবী দেখি। নিজেকে বেশ স্বাধীন মনে হয়। মাঝে মধ্যে প্রচণ্ড ইচ্ছা করে চশমাটাকে দূরে ছুড়ে ফেলে দিই। মুক্ত হই বন্দিত্ব থেকে। কিন্তু পারি না।

অসহ্য! তবে প্রয়োজনীয় এ জিনিসটাকে বাস্তব কারণেই ফেলে দিতে পারি না। তবুও স্বপ্ন দেখি মুক্তির। এ চিরসুন্দর পৃথিবীর নীল আকাশ, সবুজ গাছপালা, রাতের মায়াবী জ্যোস্না, দূরের শাদা কাশবন, সোনালি ধানের

শীষ একদিন আমি খোলা চোখে চশমা ছাড়া দেখতে পারবো এ স্বপ্ন এখন বুকের গভীরে লালন করি। যদিও জানি, ভালো করেই জানি, আমার ছোট্ট স্বপ্নটাও কোনোদিন পূরণ হওয়ার নয়। বাকিটা জীবন আমাকে কাচের দেয়ালে বন্দী হয়েই কাটাতে হবে।

হবিগঞ্জ থেকে

ধ্বংসের দিন

- রাকিব হাসান

সানগ্লাস নিয়ে আমার সব সময় এক ধরনের এলার্জি ছিল। উপকারিতা বর্ণনা করে হয়তো শেষ করতে পারবো না আমার এই নাতিদীর্ঘ জ্ঞানের পরিধিতে। আমি দেখতে একেবারে আনস্মার্ট নই মেয়েদের চোখে। কারণটা বুঝতে পেরেছি আমার যৌবনের সূচনালগ্নে। বান্ধবীদের মুখে প্রশংসা শুনে ভালো না লাগলেও খারাপ মনে হতো না।

আমি স্বভাব সুলভে মেয়েদের কখনো টিজ করা পছন্দ করতাম না। তারপরও অপরিচিতদের দেখতে ভালো লাগতো। তাই আবেগতাড়িত চোখে তাদের দিকে তাকাতাম। কিছু দিন যেতে না যেতেই এক ধরনের লজ্জা অনুভব করতাম। সরাসরি চোখে তাকানোর চেয়ে বিকল্প চিন্তা করতে লাগলাম। বিকল্প হিসেবে সানগ্লাসকে প্রাধান্য দিলাম। যেই ভাবা, সেই কাজ।

২০০০ সালে শেরে বাংলানগর ঢাকাতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় বিভিন্ন স্টল ঘুরতে ঘুরতে একটা চশমার স্টলে গিয়ে আমার একটা সানগ্লাস পছন্দ হলো। সোনালি রঙয়ের বাট আর গাঢ় কফি কালারের গ্লাস। সব মিলিয়ে বেশ সুন্দর। মুখের অবয়ব ভরাট থাকাতে আয়নায় নিজেকে দেখলাম, বেশ সুন্দর মানিয়েছে!

অনেক সাধের ময়না-কে ঘিরে স্বপ্ন দেখতে দেখতে বাড়িতে চলে এলাম। পুরনো অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তার ব্যবহার চালিয়ে যেতে লাগলাম। আমার দৃষ্টিসীমা কখন, কোথায়, কার ওপর স্থির হয় তা আমার সামনে থেকেও কেউ বুঝতে পারেনি। আমি প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখি আর মনে মনে হাসি।

যে বিপত্তি ঘটলো চশমা কেনার তিন চার মাসের মাথায় ৫ মে ২০০০-এ। এদিন এক বিখ্যাত জ্যোতিষী নস্টারডাম কর্তৃক বলা হয়েছিল পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। কর্মের তাগিদে সেদিন আমাকে বাড়ি থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দিতে হয়েছিল। ওই দিন সব বাধা উপেক্ষা করে বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন এবং প্রিয়তমাকে বলে সব কিছু ঠিক করে নিলাম। শার্ট-প্যান্ট পরে এবং সানগ্লাসটা পকেটে নিয়েছি। এই মুহূর্তে প্রকৃতির ডাকে সারা দিতে টয়লেটে যাই। ক্রিয়াকর্ম সারার পরে উঠে দাড়াতে গিয়ে ঘটলো বিপত্তি। পকেটে রাখা সানগ্লাসটা পকেট থেকে পড়ে একেবারে টয়লেটের সুড়ঙ্গের ভেতরে চলে গেল। আমি তো কিংকর্তব্যবিমূঢ়! ভারাক্রান্ত মনে টয়লেট থেকে বেরিয়ে এলাম।

মনটা একটু খারাপ হলো এই ভেবে, সবার কথা উপেক্ষা করে কর্মস্থলে যাচ্ছি আর শুরুতে ঘটলো এই ঘটনা। পথে না জানি পৃথিবী শেষ হয়ে যায়! সানগ্লাস হারানোর কথা কাউকে না বলে মনে মনে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে ঘর থেকে বাইরে পা বাড়ালাম।

দিনাজপুর থেকে

কালস্রোত

- সায়ফুল ইসলাম

কৈশোরে চশমা পরাকে একটা ফ্যাশন বলেই মনে করতাম। হয়তো সে জন্যই চশমার প্রতি একটা বিশেষ আকর্ষণও ছিল। বয়োজ্যেষ্ঠ বা সমবয়সীদের কারো চোখে চশমা দেখলে তাকে বেশ মর্ডান ও স্মার্ট মনে হতো।

তাই অজান্তে আপন মনেও চশমা পরে স্মার্ট হওয়ার শখ উথলে উঠতো। সে সময়ে চশমা অতো সহজ লভ্য ছিল না বলে মনের এই শখ নিরাশার অন্ধকারে উবে যেতো।

সেদিনের সেই কৌতূহলী বয়সে বাবার একটি অব্যবহৃত চশমা মাঝে মধ্যে চোখে লাগিয়ে তার মতো বই পড়তে চেষ্টা করতাম। সেই পাওয়ারযুক্ত লেন্সে অক্ষরগুলোকে বড় বড় দেখে চশমা চোখে নিজেকেও মনে হতো বড়সড়ো কেউকেটা হয়ে গেছি।

একদিন পকেটে পুরো চশমাটি স্কুলেও নিয়ে গেলাম। উদ্দেশ্য, সহপাঠীদের চশমার ক্যারিসমা দেখানো।

হাফ সাইজ মুখে ফুল সাইজ চমশা এটে এই রেগুলার সাইজের দুনিয়াটাকে মেগাসাইজে দেখার এক মহা হুলস্থুল মহড়া চলছে। এমনি এক রোমাঞ্চকর মুহূর্তে রাশভারী প্রৌঢ় ক্লাস টিচারের ডাক কাজে এলো, এই চশমাবাবু, এদিকে আয়।

চশমাটি হাতে ভীরু পায়ে তার পাশে গিয়ে দাড়ালাম।

চশমাটি হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখলেন তিনি। অতঃপর নিজ নাসিকা পৃষ্ঠে চড়িয়ে দিয়ে বইয়ের একটি পাতায় চোখ বোলাতে লাগলেন। ক্ষণিক বাদেই আনন্দে উদ্বেলিত কণ্ঠে বললেন, বেশ তো, চশমা দিয়ে তো আমি খুব স্পষ্ট এবং ভালোই দেখতে পাচ্ছি।

বললাম, চশমাটি আমার বাবার পরিত্যক্ত। তিনি এটি আর ব্যবহার করেন না। আপনি এটি নিঃসংকোচে নিয়ে যেতে পারেন।

চাদ হাতে পাওয়ার মতো গভীর আনন্দে চশমাটি নিয়ে তিনি চলে গেলেন।

এরপর দীর্ঘ দিন তাকে চশমাটি ব্যবহার করতে দেখেছি। চশমাটি হয়তো এখনো কোথাও পড়ে থাকবে। কিন্তু তিনি আর নেই। চশমার প্রয়োজনও তার ফুরিয়ে গেছে।

আর্থিক সংকটের আবর্তে আজও কতো নিরুপায় নিঃসম্বল প্রবীণজন যেনতেন একটি চশমার অভাবে দিকহারা নাবিকের মতো তালবেতালে হোচট খেয়ে চলেছেন। সামর্থের অভাবে ভাঙা ফ্রেম, চিড় ধরা কাচ, এমনকি একটি মাত্র লেন্সে অথবা কানে সুতোর টানা লাগিয়ে কতো নিঃস্বজনকে দিনের পর দিন অভাবী সংসারের দিন কাটাতে দেখেছি।

দিনকাল অনেক পাল্টেছে। চশমার ব্যবহার বেড়েছে যেমন, তেমনি সহজ লভ্যও হয়েছে। স্থান ভেদে ব্যবহারের জন্য নিজেরও দুই চার জোড়া চশমা রয়েছে। দেশ থেকে স্ত্রী, ছেলেমেয়েরাও ছবি পাঠায়, চোখে তাদের বাহারি চশমা।

তর তর করে জীবনের অনেকটা সময় পেরিয়ে এসে আমিও এখন চশমার বয়সে পা দিয়েছি। এখন আর নিতান্ত কৌতূহলের বশে নয়, একান্ত দায়ে পড়ে নাকের ডগায় চশমা বসিয়েছি। ইদানীং চার চোখের সাহায্য বিনা অফিস আর বাসার কোনো কাজই চালানো যাচ্ছে না। তাহলেও সার্বক্ষণিক নাসাদণ্ডে চশমা চড়িয়ে রাখা বিরক্তিকরই বটে। তাই কাজ ফোরালে এই বাড়ন্ত চোখ দুটো পকেটে চালান দিই।

বহনের সুবিধার্থে একটি ফোল্ডিং চশমা নিয়েছি। এটির বাহু দুটির মধ্য ভাগে আর লেন্স জোড়ার বৃজ বরাবর ভাজে ভাজে গুটিয়ে ছোট করে এটিকে হাতের মুঠোয় নেয়া যায়।

এভাবে গুটিয়ে চশমাটিকে দলা পাকাতে দেখে আমার ছোট্ট মেয়েটি বিস্মিত হয়েছে। কৌতূহলী চোখে চশমাটিকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলো সে।

কৌতুকবশে বললাম, উচু শেলফ থেকে ফসকে পড়ে চশমাটির ঠ্যাং জোড়া আর হাড়গোড় ভেঙে গেছে। তাই তো এটিকে মুড়িয়ে ফেলতে পারি।

বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দোলায়িত তার ছোট মনটি এই গুরুতর দুর্ঘটনায় আঘাতপ্রাপ্ত চশমাটির করুণ অবস্থার জন্য ব্যথিত হলো।

সকালে সংবাদপত্রে চোখ বোলাতে গিয়ে যখনি তাকে আমার চশমাটি নিয়ে আসতে বলি, অমনি সে জানতে চাইবে কোন চশমাটি। তোমার সেই ঠ্যাং ভাঙা চশমাটিই কি নিয়ে আসবো? প্রতিবারই কমন প্রশ্নটি ছুড়ে দেবে সে।

হেসে বলি, হ্যা মামণি, ঠ্যাং ভাঙা চমশাটিই নিয়ে এসো।

মুহূর্তে চশমাটি এনে তার ছোট্ট হাতে গুটানো ঠ্যাং দুটো সোজা করে আমার নাকের ডগায় চড়িয়ে দিয়ে একটি চাদের হাসি উপহার দেবে সে।

পত্রিকা পাঠ রেখে কিছুক্ষণের জন্য আমিও চশমার ফাকে সেই করিৎকর্মা আদুরে কচি মুখটির দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি।

সউদি আরব থেকে

শিউলি

– মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম

আজ থেকে অনেক দিন আগের কথা। আমি তখন রাজবাড়ী সরকারি কলেজে এইচএসসি–র ছাত্র। চশমা আমার খুব প্রিয়। চশমা পরা মানুষ দেখলে, বিশেষ করে মেয়ে দেখলে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে বেশ ভালো লাগতো। লাগবেই না কেন? সে সময়টা সকলের একই রকম। আমি চশমা পরতাম না। কারণ তখনো চোখ ভালো ছিল।

একবার বর্ষাকালে কলেজ থেকে বের হয়েছি। এমন সময় ঝম ঝম করে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। ভিজতে ভিজতেই পথ চলছি। আরো অনেকেই আমার মতো ভিজতে ভিজতে চলছে। হঠাৎ আমার পাশের পথ চলা মেয়েটা আমার পায়ের ওপর এসে হুমড়ি খেয়ে পড়লো।

আমি প্রচণ্ড লজ্জায় দূরে সরে যেতে চেষ্টা করতেই সে আমাকে বললো, আমার চশমাটাতে পানি পড়ায় আমি কিছুই দেখতে পারছি না। আমার চশমাটা একটু পরিষ্কার করে দেবেন?

মনে মনে খুব কষ্ট পেলাম। তারপর তাকে হাত ধরে নিয়ে পাশে দোকানের শেডের নিচে দাড়ালাম। এই প্রথম কোনো মেয়ের হাত ধরার সুযোগ পেলাম। মনে মনে নিজেকে খুব হিরো মনে হলো। নিজের অনুভূতিতেও কিছু একটা অনুভব করতে পারলাম। নিজেকে সামলে তার চোখ থেকে চশমাটা নিয়ে পকেট থেকে রুমাল বের করে পরিষ্কার করে দিলাম। কিন্তু পরিষ্কার করলে কি হবে! তখনো একটানা বৃষ্টি পড়ছে। কিছু দূর যেতেই আবার চশমা ঘোলাটে হয়ে যায়।

তারপর মেয়েটা আবার আমাকে বললো, এভাবে পথ চলা যাবে না। কখন যে রেললাইনের পাশের খাদে পড়ে যাবো তার ঠিক নেই, বরং আমার হাতটা ধরে আমাকে আপনি একটু নিয়ে চলুন। চশমা ছাড়া আমি কিছুই দেখতে পাই না।

প্রায় দুই মাইল রাস্তা তাকে এভাবে হাত ধরে নিয়ে বাড়ি পৌছে দিলাম।

পথে যেতে যেতে অনেক কথাই হলো। সে জানালো, আমার নাম শিউলি। আমাদের বাড়ি বেনীনগর। এবার আইএ ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি।

আমার পরিচয় দিলাম। আমি আইএ সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি। এ পর্যন্তই।

শিউলি বললো, আমি আপনাকে চিনি। একদিন একটা মেয়ে আপনাকে দেখিয়ে বলেছে, ওই ভাইয়াটা ফার্স্ট ইয়ারে সেকেন্ড স্থান অধিকার করেছে। আরো কিছু কথা বলেছে। কিন্তু সেটা আজ বলবো না, পরে একদিন বলবো।

তারপর থেকে প্রতিদিন শিউলি রাস্তায় দাড়িয়ে থাকতো যতোক্ষণ আমি না আসতাম। সেকেন্ড ইয়ারে যতোদিন ক্লাস করেছি ততোদিনই আমার সঙ্গে শিউলি ক্লাসে আসতো এবং এক সঙ্গেই ক্লাস থেকে যেতাম।

এভাবে যাওয়া–আসা নিয়ে অনেকেই অনেক কথা বলেছে। অবশ্য তাদের কথা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা ছিল তাও নয়। তার সঙ্গে অনেকটা প্রেমের সম্পর্কই গড়ে উঠেছিল বটে কিন্তু তা খুব বেশি দূর গড়াতে পারেনি।

আমার ক্লাস তিন মাস পরেই শেষ হয়ে যায়। পরীক্ষা এসে গেল।

পরীক্ষা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ি থেকে ডাক এলো। চলে গেলাম গ্রামের বাড়িতে। কয়েকদিন পরেই ঢাকায় মেজ ভাইয়ের বাসায় পাড়ি জমাতে হলো।

প্রথম কিছু দিন চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ ছিল। তারপর একদিন খবর পেলাম শিউলির বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। সে লিখেছে, যদি সম্ভব হয় তাহলে এসে আমার সঙ্গে দেখা করো।

সেটা আর সম্ভব ছিল না।

সেই যে শিউলি হারিয়ে গেল আর কখনো তাকে দেখিনি। যে চশমার বদৌলতে তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল সেই চশমা ছাড়া আমি নিজেও এখন চলতে পারি না।

সউদি আরব থেকে

polak103@hotmail.com